গ্র ন্থ সূ চি

ক বি তা স ম গ্র

কবি অরুণকুমার

ভাবা গিয়েছিল যে, তা অন্তত আড়াইশো-তিনশো পৃষ্ঠা লাগবেই। কার্যত কিন্তু দুশোরও দরকার হল না, তারও বেশ-কিছু কম পৃষ্ঠার মধ্যে অরুণকুমারের তাবৎ কবিতার স্থান-সংকুলান হয়ে গেল। তাবৎ কবিতা, অর্থাৎ তাঁর যে দুটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই 'দূরের আকাশ' ও 'যাও, উত্তরের হাওয়া'র অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রচনা তো বটেই, উপরন্তু তাঁর যে-সব কবিতা নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলেও পৃথক কোনও গ্রন্থে ইতিপূর্বে সংকলিত হয়নি, অথচ সংখ্যায় যা তাঁর গ্রন্থবদ্ধ কবিতার চেয়ে কম তো নয়ই, বরং অনেক বেশি, তাও।

ব্যাপারটা হয়তো অনেকের কাছেই বিস্ময়কর ঠেকবে। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা দু'চার বছর কবিতা লিখেই যাঁরা ফুরিয়ে যান, এমন আর কোনও কথা খুঁজে পান না, যা পদ্যবন্ধে না-বললেই নয়, অরুণকুমার যে সেই গোত্রের কবি ছিলেন না, তা তাঁরা জানেন। তাঁরা নিশ্চয় এটাও জানেন যে, যদিও তিনি দীর্ঘ আয়ুষ্কালের অধিকারী ছিলেন না, মারা গিয়েছিলেন মাত্রই আটান্ন বছর বয়সে, তবু বিভিন্ন পর্যায়ে রচিত তাঁর কবিতা থেকে একটা কথা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা এই যে, তাঁর জীবদ্দশার কোনও পর্যায়েই এই কবির ভাবনাচিন্তা কিছুমাত্র ঝিমিয়ে পড়েনি, এবং সেই ভাবনাচিন্তাকে কবিতার মধ্যে ধরবার যে ক্ষমতা, তাঁর ক্ষেত্রে সেটাও আদ্যন্ত পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ ছিল। যেমন তাঁর প্রথম তারুণ্যের, তেমন পরিণত বয়সের কবিতাও আমাদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, অধিকার করে, উদ্বেল করে, এবং—পাঠসমাপন হবার পরেও—অনেকক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনও কাজে আমরা মন বসাতে পারি না।

সেই কবি যে এত কম লিখেছিলেন, এটা বিশ্বাস করা একটু কঠিন বই কী। কঠিন আরও এই কারণে যে, চল্লিশের দশকের সূচনা থেকেই বাংলা কবিতার যে দুটি স্পষ্ট ধারাকে আমরা পাশাপাশি বইতে দেখি, তিনি ছিলেন তারই একটির অত্যন্ত সমর্থ রূপকার। যা আমাদের বাস্তব জীবন, সেই ধারায় তার রূঢ়তা যে কখনও উপেক্ষিত অথবা অস্বীকৃত হয়েছে, তা নয়, কিন্তু সেখানে একইসঙ্গে মান্যতা ও স্বীকৃতি পেয়েছে সেই জীবনও, বাস্তবের কঠিন জমির উপরে দাঁড়িয়েও যা মাধুর্যের স্বপ্ন দেখতে ভোলে না। যেহেতু তিনি সেই ধারাকেই আদর্শ বলে জেনেছিলেন ও নিবিষ্ট ছিলেন তারই পুষ্টিসাধনে, অরুণকুমারের কবিকৃতিকে তাই কখনওই আমরা একদেশদর্শিতায় খণ্ডিত হতে দেখি না। বস্তুত, আঁস্তাকুড়ে পা ডুবিয়েও যে-জীবন চারপাশের বৃক্ষলতা ও মাথার উপরকার আকাশটার দিকে চোখ রাখে, কবি হিসাবে তিনি তারই দিকে বারবার আকর্ষণ করেছেন আমাদের আগ্রহকে। একইসঙ্গে আঙুল তুলেছেন এমন-কিছু মানবিক মূল্যবোধের প্রতি, নানা দুর্যোগের মধ্যেও মানুষকে যা বেঁধে রেখেছে বলেই মনুষ্য-পরিচয় আজও একটা দুর্বহ বিড়ম্বনার ব্যাপার হয়ে ওঠেনি।

চিৎকৃত যে আশাবাদ এককালে এক ধরনের বাংলা কবিতার চরিত্রলক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অরুণকুমার যে কদাচ তাতে আস্থা রাখেননি, তাঁর পাঠকদের তা না-জানবার কথা নয়। ('না, না, মূর্খ এই আশাবাদ !/পাথুরে কঠিন মাটি/ কে করে আবাদ।') কিন্তু তাঁরা এটাও জানেন যে, নৈরাশ্যবাদীও তিনি ছিলেন না। নাগরিক নানা ছলাকলা সম্পর্কে তাঁর কবিতার কোথাও যে দু'চারটে ঠেস-দেওয়া কথা নেই, তা নয়, ইতস্তত সেগুলি ছড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তাকেই যদি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অনাস্থার প্রমাণ বলে আমরা গণ্য করি তো মস্ত বড় ভুল করব। অরুণকুমার আসলে এমন কোনও মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক তাবৎ আধিব্যাধির একমাত্র মোক্ষম দাওয়াই হিসাবে যা অনেকে ফিরি করবার চেষ্টা করেন। না, অমন কোনও সর্বরোগহর পাঁচন কিংবা সালসায় নয়, তিনি আস্থাশীল ছিলেন মানবসমাজের অন্তঃস্থ সেই শুভবুদ্ধিতে, যা আছে বলেই সর্বনাশের কিনার অব্দি পৌঁছে গিয়েও মানুষ শেষপর্যন্ত সম্মিলিতভাবে খাদের মধ্যে ঝাঁপ দেয় না।

তা ছাড়া, একটু নজর করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনের উপরেও জোর পড়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর বন্ধুতা পেয়ে আমরা যারা ধন্য হয়েছিলুম, এবং সেই বন্ধুতার সূত্রেই যাদের শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর এমন অনেক কথা, যা তিনি কখনও লিপিবদ্ধ করেননি, তারা বলতে পারি যে, প্রকৃতি এই কবির কাছে নেহাতই বর্ণনীয় একটা বিষয় মাত্র ছিল না, বস্তুত মনুষ্যজীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং সর্ববিধ বিকার থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে ওই মেলবন্ধনকে তিনি একটা আবশ্যিক শর্ত বলে গণ্য করতেন।

নানা বিষয়ে কবিতা লিখেছেন অরুণকুমার। যেমন প্রেম, প্রকৃতি ও সামাজিক নানা ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে ছায়া ফেলেছে তাঁর কবিতায়, তেমনই আবার ঈশ্বরবিষয়ক ভাবনাকেও খুবই সহজে তাঁর কবিতায় তিনি স্থান দিয়েছেন। ('আমার ঈশ্বর শুদ্ধ শিল্প/গড়নে অপরূপ, ভাবনে মুগ্ধ...'।) তবে, মানুষই যে ছিল তাঁর আগ্রহের প্রধান বিষয়, তাতে সন্দেহ করি না। আরও স্পষ্ট করে বলতে পারি, মানুষের প্রতি যে অন্তহীন ভালবাসা তাঁর চিত্তে তিনি বহন করতেন, মূলত তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে তাঁর কবিতা। তার অর্থ এই নয় যে, মানুষের বোকামি, ভণ্ডামি অথবা নষ্টামিকে তিনি কখনও তাঁর কবিতার কোথাও তিরস্কার করেননি। অবশ্যই করেছেন। যেমন তিরস্কার করেছেন, তেমন ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেছেন বই কী। কিন্তু তাও মূলত তার উদ্বেগ থেকেই জাত, যে উদ্বেগও আসলে মানুষ সম্পর্কে তাঁর দুর্মর আসক্তি ও ভালবাসারই প্রমাণ দেয়।

বিভিন্ন কবির কপালে 'বিদ্রোহী' 'বিপ্লবী' 'প্রকৃতিপ্রেমিক' ইত্যাদি সব লেবেল এঁটে দেওয়ার যে রেওয়াজ দেখতে পাই, আমরা সেটা এই কারণে পছন্দ করি না যে, কবিকে ওতে করে একটা খণ্ড-পরিচয়ের ফ্রেমের মধ্যে আটকে দেওয়া হয়। অরুণকুমারকে তবু যে 'ভালবাসার কবি' বলতে প্রলুব্ধ হচ্ছি আমরা, তার

কারণ, নানাবিধ পরিচয়ের ভিতর থেকে তাঁর ওই পরিচয়টাই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় হয়ে তাঁর পাঠকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

অরুণকুমার যে কখনও গদ্যকবিতা লেখেননি, তা নয়, তবে বাংলা কবিতার প্রচলিত তিন ছন্দেই—দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্তে—তাঁর উৎসাহ ছিল সমধিক। চার, পাঁচ, ছয় ও সাত, এই চার রকমের মাত্রার কলাবৃত্তের প্রতিটিতেই তাঁর পদচারণা এত অনায়াস ও সাবলীল যে, দেখে আমরা অবাক না-মেনে পারি না। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, বাংলা কবিতায় সাত-মাত্রার কলাবৃত্তের তিনি ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী ; এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ওই ছন্দকে এত সার্থকভাবে আর-কেউ কাজে লাগাতে পারেননি।

যেমন ছন্দে, তেমন শব্দ-নির্বাচনেও তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। যেখানে যে শব্দটি ব্যবহার করা দরকার, ঠিক সেটিকেই লাগাতেন বলে কবিতার পঙ্ক্তিগুলি যেন হঠাৎই একটা বাড়তি মাত্রা পেয়ে গিয়ে একেবারে ঝলমল করে উঠত। যাকে 'মিউজিক অব পোয়েট্রি' বলে, শব্দ-নির্বাচনের সময়ে কবিতার সেই ধ্বনিমূর্ছনার দিকেও যে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, তার সাক্ষ্যও তো তাঁর কবিতার মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে।

এত সব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল বলেই রবীন্দ্রপরবর্তী কবিদের মধ্যে অরুণকুমারের কবিতার পঙ্ক্তিই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি স্মৃতিবিধৃত হয়েছে। 'যদি মরে যাই/ ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই…', 'মেয়েদের ভালবেসো না, মন,/ প্রাপ্তি তো শুধু যন্ত্রণাই।', 'কোনোই আনন্দ নেই অগ্রহায়ণে', 'ভালবাসা তুমি সুদূর শঙ্খচিল/ অনেক দূরের নীলে।', 'যৌবন যায়। যৌবনবেদনা যে/ যায় না। সহসা ব্যাকুল বিকেলে বাজে/ স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাত সাগরের দোলানি।', 'প্রতিধ্বনি ঘোরে কক্ষে কক্ষে :/ কে আছ ? কেউ আছ ? কেউ কি নেই হে ?', 'পুরনো বন্ধুরা যত স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে'—কত আর লাইন উদ্ধার করব, তার দরকারও বোধ হয় নেই, কিন্তু যা না-বললেই নয়, সেটা এই যে, টুকরো-টুকরো এ-সব লাইন এককালে যেমন আমাদের মুখে-মুখে ফিরত, এখনও ফেরে, তেমন নবীনবয়সীদেরও মুখে-মুখে অনেক সময় ফিরতে দেখি, যদিও তাঁদের অনেকেই হয়তো জানেন না যে, এ-সব পঙ্ক্তি কার লেখা।

এবারে জানবেন, এবং বৃহত্তর পাঠক-সমাজে সমাদর ঘটবে অমিতশক্তিধর কিন্তু আত্মপ্রচারে-সততপরাঙ্মুখ সেই কবির রচনার, এই আশায় একালের হাতে তাঁর 'কবিতাসমগ্র' আমরা তুলে দিচ্ছি।

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রকাশকের নিবেদন

প্রয়াত কবি অরুণকুমার সরকারের দুটি কাব্যগ্রন্থ—'দূরের আকাশ' ও 'যাও, উত্তরের হাওয়া'—ছাড়াও পৃথক চারটি কবিতাগুচ্ছ এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। 'সংযোজনা-১' অংশে আছে কবির সেই কবিতাবলি, পৃথক কোনও গ্রন্থে সংকলিত না-ই হোক, 'অরুণকুমার সরকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় যা প্রকাশিত হয়েছিল। 'সংযোজনা-২' অংশে সে ক্ষেত্রে সেই অগ্রন্থিত কবিতাবলি দেওয়া হল, যা তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনেও নেই। 'সংযোজনা-৩' অংশে আছে অগ্রন্থিত এমন কয়েকটি কবিতা, যা মূলত ছোটদের জন্য লেখা। এর মধ্যে প্রথমটি—'বাবুন-রিমা-শম্পা-বুকুন-কে'—শ্রেষ্ঠ কবিতায় ছিল, অন্যগুলি ছিল না। 'সংযোজনা-৪' অংশে আছে তিনজন বিদেশি কবির পাঁচটি কবিতার বাংলা তর্জমা। এগুলি ইতিপূর্বে অরুণকুমারের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় ছাপা হয়েছিল, তবে তাঁর পৃথক কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি।
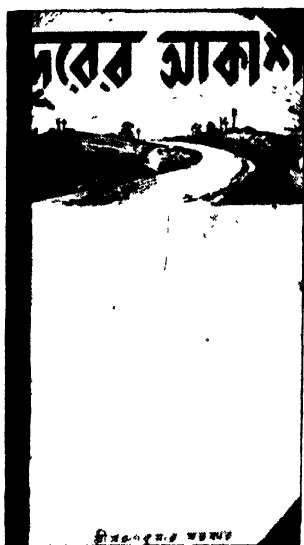
দূরের আকাশ

সূচিপত্র

জন্মদিনে

(শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুকে)

সিন্দুক নেই ; স্বর্ণ আনিনি,
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য ।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য ?

দুরাশা আমার সীমাহীন বটে
তবুও কি জানি দৈবে কী ঘটে ।
দ্বিধাবিজড়িত লজ্জাপীড়িত
এ-হৃদয় ঝাউবৃক্ষের পাতা,—
যার জানালায় দু'বাহু বাড়ায়
নেই সেই জন ঘরে অবশ্য ।

এই তো সেদিন সারা প্রান্তরে
সময়ের সোনা দূরবিস্তৃত । ...
হায় রে, কখন কেটেছে সকাল,
দুপুর ছুঁয়েছে বিকেলের লাল ;
তারার আলোতে ভেসে গেছে স্রোতে
গানের প্রাণের হিজিবিজি খাতা !
আজ মাঝরাতে নেই বিছানাতে
ঘুমের মাঠের সবুজ শস্য ।

মাথা পেতে তবে মেনে নিতে হবে
শাদা আরশির নিরেট ব্যঙ্গ ?
যে-কুসুমগুলি মেখেছিল ধূলি
তা-ও কি পাবে না তোমার সঙ্গ ?

স্মৃতি থেকে তাই এনেছি দু'মুঠো
গন্ধমদির আমন ধান্য ।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য ?

শ্রাবণে

যে-আশা দিয়েছিলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও
মলিন দিনগুলি মলিনতর হোক ।
শ্রাবণে সন্ধ্যায় অঝোর মায়ালোকে
চাইনে উজ্জ্বল তোমার মুখচোখ ।

কোথায় ছিলে তুমি ভোরের সরোবরে ?
দুপুর রি রি জ্বলে—তুমি তো দ্যাখো নাই
বিকেলে হৃদয়ের বাতাস উতরোল,
আলোর হাহাকারে তুমি তো আসো নাই ।

এখন পাহাড়ের বিলোল বনভূমি
কথার ঝরা পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যাও ।
সুদূর রজনীর গোপন জুঁইফুলে
যে-আশা দিয়েছিলে ফিরিয়ে নিয়ে যাও ।

প্রার্থনা

যদি মরে যাই
ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই ;
যে-ফুলের নেই কোনো ফল
যে-ফুলের গন্ধই সম্বল ;
যে-গন্ধের আয়ু এক দিন
উতরোল রাত্রিতে বিলীন ;
যেই রাত্রি তোমারই দখলে
আমার সর্বস্ব নিয়ে জ্বলে,
আমার সত্তাকে করে ছাই ।
ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই ॥

কোনো মেয়েকে

তোমাকে কি দেব উপহার
স্মৃতিটুকু সকালবেলার ?
তাই নিয়ে তুমি খুশি হবে ?
হবে না ? কী আর করি তবে !
বিকেলে কেমন ক'রে, বলো,
এনে দিই রোদ ঝলোমলো ?

তার চেয়ে আমাকেই নাও
থরথর দু'হাত বাড়াও
নিয়ে যাও তোমার সকালে,
কামরাঙা ডালিমের ডালে।

অন্য কোনো মেয়েকে

এসো নাকো আমার শয্যায়
এসো নাকো প্রাত্যহিকতায়।
ছেঁড়াখোঁড়া ভাঙা-তোবড়ানো
ব্যর্থতা রয়েছে ছড়ানো
এলোমেলো মলিন চাদরে।
এসো নাকো, প্রেম যাবে মরে ॥

আমার যা চেহারা পোশাকি
তারও মাঝে আছে ঢের ফাঁকি।
তবু সেই মিথ্যাও নন্দিত
বাঁচবার প্রয়াসে ছন্দিত।
এইখানে, বিষণ্ণ এ-ঘরে,
প্রেম আশা স্বপ্ন যায় ঝরে।
এসো নাকো আমার শয্যায়
এসো নাকো প্রাত্যহিকতায়।

কুন্তলার জন্য

তোমাকে ভালবেসেছি, কুন্তলা,
স্বপ্ন যেন আমার পথ-চলা,
নৃত্য যেন আমার রাত্রিদিন,
হৃদয় লঘু বাতাসে উড্ডীন।
তোমার প্রেম হোক না শুধু ছলা,
তোমাকে ভালবেসেছি, কুন্তলা!

আমার গ্রামের নদীকে

অটুট ধারণা ছিল
প্রেম নাহি জানে পরাজয়।
নদি, তুই বড়ই নির্দয়!

স্মৃতি তার পেল না সম্মান
গর্ব খানখান
চৌচির আমার হৃদয় ।
নদি, তুই বড়ই নির্দয় !

হোগলার বাহুডোরে ঘাস
নিয়ে আছে আদিম বিশ্বাস :
আজও আন্‌মনা
বাবলার হলদে কামনা ;
নারিকেল- সুপারি-পাতায়
বাতাসের ঠোঁট ছুঁয়ে যায় ;
কয়েকটি চিল
গায়ে মাখে আকাশের নীল ;
সবই ঠিক আছে
চেনা মাটি আনাচে-কানাচে ।

তবু কেন এত অবহেলা ?
কথা নেই, কেটে যায় বেলা
কেন সংশয় ?
চেয়ে দ্যাখ্ আমি অবিকল
সেই-ই আছি, স্মৃতিসম্বল
প্রণয়ে অব্যয় ।
নদি, তুই হোস্‌নে নির্দয় ।

বুঝেছি রে কোথা তোর জ্বালা
কেন তোর দরোজা জানালা
একান্ত একাকী ।
ব্যর্থ বুঝি তোর অশ্রুজল
মাঠে, আহা, ফলেনি ফসল,
তাই শুষ্ক আঁখি ?

কেউ আর টানে না উজান
গান নেই তাই অভিমান
চোখে মুখে বালি ?
শোন তুই এ-দিন ফুরাবে
ধান হবে আর গান গাবে
মাঝি ভাটিয়ালি ।
প্রাণ তার দেবে পরিচয় :
নদি, তুই হোস্‌নে নির্দয় !

হীরামন

কে কাঁদে রৌদ্রের জ্যোছনাতে
ঝাউয়ের পাতা কি ?
সাগরের আকাশী ইচ্ছার
নীলবর্ণ পাখি ।

শালিক বালির নদী ঘুমঘুম রোদ্দুরে,
শিমুল পলাশে লাল রক্তাক্ত দুপুরে,
কা'র কান্না চুনি পান্না মুক্তো নিয়ে থাকি
সমুদ্রের অভীপ্সার নীলবর্ণ পাখি ?

বিচিত্রা দাশ

লিখলুম বিচিত্রা দাশকে :
বহুদিন দেখিনি আকাশকে,
উষ্ণ তোমার স্মৃতি তবুও
আমার এ-হৃদয়ের ফ্লাস্কে ।

তারপর আর কী-যে লেখা যায় ।
কাটে দিন, দিন যায়, দিন যায় !
মনে হয় ধূলি-ঝড়ঝঞ্ঝায়
ক্রমেই ঝাপসা কৈলাসকে ।

ঝলমল ফাল্গুনে পৌঁছে
মখমল সহৃদয় কৌচে
ব'সে নীল ধোঁয়া ছেড়ে স্বগত
কাকলি শোনাব লাল গ্লাসকে ।

বেলোয়ারি সে-বাসনা শৌখিন
বুলবুলি পুষিনিকো কোনোদিন,
চায়নি শালিক গৃহপালিত
করিতকর্মা কোনো জিনকে ।
ঈর্ষা করিনি আলাদিনকে ॥

তবুও ব্যর্থশ্রম জাবদায়
নড়বড়ে চাকা-ভাঙা রিকশায়,
চলা ভার, ঘুণ ধরে নকশায়,
দুর্বহ লাগে দূরবিনকে ।

খাঁ খাঁ মাঠ, হাহাকার খালবিল
আহা তবু রঙ আছে লাল নীল ।
কেননা শ্রীবিচিত্রা দাশকে
উষ্ণ রেখেছি এই ফ্লাস্কে ।

মালবিকা হালদার

মালবিকা হালদারকে মনে পড়ে বর্ষার সন্ধ্যায়
ব্রিস্টলে টেম্পেলে মন্টিকার্লোর প্রেক্ষিতে ।
তার চোখ তার মুখ অভিনব আশ্চর্য গোধূলি
মেঘাকীর্ণ সময়ের মনোলীন মন্থরতায়
মালবিকা হালদারের মুখ মনে পড়ে ।

হস্তিনী মেয়ের মতো কদাকার এই পৃথিবীতে
শঙ্খিনী মেয়ের মতো মালবিকা হালদারের দাঁত
অথবা অদ্ভুত-আঁখি দার্শনিক মহিষের মতো
কর্দমাক্ত পর্যুদস্ত হৃদয় যখন ।
তাই তো দীর্ঘ ক্লান্ত দিবসের ঘৃণ্য ব্যভিচারে
শ্রান্ত হয়ে মালবিকা হালদারের মুখ মনে পড়ে
মেঘম্লান বর্ষার সন্ধ্যায় ।

টেম্পেলে এন্তার লোক—লম্বা বেঁটে ফরসা ময়লা
কেরানি প্রেমিক কবি অভিনেতা ব্যর্থ ধড়িবাজ
রেসুড়ে আর্টিস্ট বেশ্যা দেশোদ্ধারী পাটের দালাল ।
এক কোণে শ্বেতপাথরের টেবিলেতে আমরা দু'জন
চুপচাপ বসে আছি পৃথিবীর গোলগাল মুখে লাথি মেরে
থুথু ছুঁড়ে মানুষের চাঁদপানা মুখের উপর ।
তারপর অনেক নদীর ঝাল গিলে, টাল খেয়ে দেদার নদীর
পৃথিবীকে ধীরে ধীরে বসবাসযোগ্য মনে হলে
কর্তব্যের বশীভূত হয়েই হঠাৎ
নেবুকাডনেজারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরাকার
অজস্র কথার ভিড়ে ছ্যাকছ্যাকে বর্ষার সন্ধ্যায়
ডুবে আছি জ্ঞানমৌন আমি আর
মৌসুমী মেঘের মতো আশ্চর্য আশ্চর্য
মালবিকা হালদারের নাক মুখ চোখ কান
আর এক ময়ূরের ডিমের মতন
ধূসরাভ কবোষ্ণ হৃদয় ।

মালবিকা হালদারের মুখ মনে পড়ে ।

মালবিকা হালদারের ইস্পাতের মতো দুটি কান
মনে হল মেয়েদের হৃদয়ের আদানপ্রদান
সেই কান থেকে আরও কানে কানে কানাকানি করে
যেমন রৌদ্রের আলো নারিকেলপাতার ভিতরে ।

মালবিকা হালদারের ঢাক ঢোল দ্রিমিকি দ্রিমিকি
টুংটাং টাংটুং হ্রিংহ্রিং ঝিমিকি ঝিমিকি
বোস্টুমির একতারা তারাভরা তাবড়া তাবড়া
এবড়ো খেবড়ো পথে মালবিকা হালদারের বুক ।

মালবিকা হালদারের মুখ মনে পড়ে ।

অঙ্কুর মুখুজ্জে

অঙ্কুর মুখুজ্জে জানি জীবনের বন্ধ্যা মহীরুহে
নিজের মনের রঙে অপরূপ সবুজ ডাবের
তৃষাবহ ছবি এঁকেছিল । ভেবেছিল দুই আর দুয়ে
চার হয় । খুঁজেছিল বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের
দৃষ্টি নিয়ে ভূগোলের হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস ।
সে-ডাবেতে জল নেই, সে-যোগেতে মিল নেই দেখে
অঙ্কুর মুখুজ্জে শেষে নিরাসক্ত সম্পূর্ণ মানুষ
হয়ে গেল : বুঝে নিল পথগুলি চলে এঁকেবেঁকে ।

অঙ্কুর মুখুজ্জে তাই দ্ব্যর্থবোধক হাসি হাসে
ভেবো না সে পৃথিবীকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসে ।

অঙ্কুর মুখুজ্জে আজও বালুর উপরে মাথা রেখে
চোখ বুজে দুই হাতে হাতড়ায় লাল নীল নুড়ি,
জানি সে আরেকদিন অশ্বারোহী উট্রমকে দেখে
রক্তে খুঁজেছিল তার রণমত্ত মুহম্মদ ঘুরি ।
অঙ্কুর মুখুজ্জে জানে বালখিল্য এই চপলতা
মাঝে মাঝে মন্দ নয় খানিকটা আত্মিক সুড়সুড়ি ।

পৃথিবীর ব্যবহার প্রসন্নবদনে
হয়ত সে করেনি গ্রহণ, হয়ত সে ভেবেছে সমাজ
শতচ্ছিন্ন তাই রিফুকর্মের অতীত ।
অঙ্কুর মুখুজ্জে তবু পোতাশ্রয়ী ত্রিভঙ্গ জাহাজ

নয় জানি। ভঙ্গ দিয়ে মানসিক রণে
অঙ্কুর মুখুজ্জে শুদ্ধ ঊর্ধ্বহিতাহিত।

অঙ্কুর মুখুজ্জে বাস করে নাকো বনে
সকালে উঠেই তাই নমস্কার করেছে সূর্যকে :
'কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্যকে
হে জবাকুসুমকান্তি, পূর্ণ করো আমার জীবনে।'
কিন্তু আকাশ-মাটি ব্যবধান বাস্তবে ও মনে
অঙ্কুর মুখুজ্জে তাই বাস করে বনে।

অঙ্কুর মুখুজ্জে যদি জীবনের নয়া মূল্যবোধে
অবিচল আস্থা রেখে চলে যায় সোজা ময়দানে,—
সেখানে সাধ্য কার পিতামহ তার পথ রোধে ?
অঙ্কুর মুখুজ্জে তবু রুক্ষচুল, ব্যর্থ মুক্তিস্নানে।
কেননা কক্ষাবর্ত পৃথিবীর রূঢ় ব্যাকরণে
আর্ষপ্রয়োগ নেই। যুগে যুগে দর্জির দোকানে
মানুষের নবরূপ যদিচ তরঙ্গ আনে প্রাণে
নেপথ্যে আদিম আত্মা নিমগ্ন অচলায়তনে।
তাই তো নিষ্ফল কর্ম, ধর্ম ব্যর্থ, জন্ম ঋণশোধ
অঙ্কুর মুখুজ্জে জানে অর্থহীন নয়া-মূল্যবোধ।

কিন্তু নাছোড়বান্দা মানবিক পদস্খলন
রেহাই দেবে না কোনো রক্ত আর মাংসের পিণ্ডকে।
অঙ্কুর মুখুজ্জে নেবে কমনীয় ত্বকের স্মরণ
এবং তালাক দেবে জিজ্ঞাসার নির্বোধ ষণ্ডকে ?

জীবনের সেই কি ফোয়ারা ?
সারা ! রারা !! রারা !!!

জীবনানন্দ

একটি মেয়েলি ছেলে নাবালক ছাগলের মতো
চঞ্চল অধীর। ট্রামের জানালা থেকে হেরিলাম তারে।
তাহার উড্ডীন দেহ ভায়োলেট রঙের শেমিজে
আহা কিবা মানায়েছে। ষাঁড়ের ভাগাড়ে

বিলুপ্ত বাছুর যেন অপরাহ্নে ঘাস খুঁজে ফেরে।
কৃষ্ণচূড়ার গাছ লেনিনের পরমাত্মীয় ?

চাইনি, পেয়েছি তবু পৈতৃক ঋণ
কতিপয় হাড় আর লবেজান এ-হৃদয়, প্রিয় ।

আমাদের স্বপ্ন জানি হবে দানাদার,
দানাদার হয়ে যাবে পুরুষানুক্রমে ;
অথবা নিশ্চিহ্ন হবে রুগ্ন পাণ্ডুলিপি
নিমগ্ন ইঁদুরের নির্ভুল বিক্রমে ।

নাবালক ছাগলের প্রগল্‌ভতা সহ্য যায় জানি
গাংটক আর গাংচিলের প্রহরে
মনোহরপুকুরের মনোরমা মুখুজ্জের মুখ
জীবনে আনন্দ যদি এনে দেয় দু'দণ্ডের তরে ।

এ কী গ্রীষ্ম ভাই

বাইরে খর্বগর্ব শহর এক
অতিকায় কচ্ছপের লাশ ।
নববধূর জটিল অন্তর্বাস
এই সময় । আর বাতাস
আদিম অগ্নিদেবতার নিশ্বাস ।
নির্দয় দ্বিপ্রহরে হৃদয়
আইঢাই করে ।

দূর বহু দূরে হিমজঙ্ঘার দেশ
ময়দানে শিরীষ মুচুকুন্দ ফুলের লীলারঙ্গ শেষ ।
হোক না মনের যাবতীয় আবাদ
দৃষ্টান্তিত ভূতচৈতন্যবাদ,
আমরা কানামাছি
জারুলের কাছাকাছি
কৃষ্ণচূড় সন্ধ্যায়
তোমাকে বেকায়দায়
পাব
অহো, বুক-ঝলসানো শহর
তোমার মেদমাংস
খাব ।

রেস্তরাঁয়

(১)
দুপুর বেলা। চৌকো আকাশ। লাগছে বেশ।
মনে পড়ে পার্ক স্ট্রিটের ম্যাগ্নোলিয়ায়
ফিরিঙ্গিনির গ্রীষ্মকাতর পৃষ্ঠদেশ!
একটু আগেই হিন্দি ছবির মেয়েটাকে
চোখ ঠেরেছে ফিরতি পথের কেরানিরা।
মনের বনে মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে
গান ধরেছে: কোথায় ফাজিল যুবতীরা,
আয় এখানে দুপুর বেলার কল্পনায়
চায়ের কাপে জীবন কাঁপে যন্ত্রণায়।

(২)
গর্ভবতী ইতিহাস
এইবার
কী সন্তানে জন্ম দেবে তুমি
তাই ভেবে ভয় পাই আজ।
তোমার সন্তান যত
মৃত বা জীবিত
সবাই বিকৃতরতি
বিকলাঙ্গ সব।
ব্যভিচাবী অত্যাচারী লম্পট সন্ন্যাসী
তোমার প্রথম পুত্র ধূর্ত সে কপট;
তোমার দ্বিতীয় পুত্র স্বেচ্ছাচারী সামন্তনৃপতি;
তোমার তৃতীয় পুত্র লোলজিহ্ব বণিক শ্বাপদ।
এইবার
কী সন্তানে জন্ম দেবে তুমি
গর্ভবতী ইতিহাস?

প্রজাপতির খেদ

শতদল, তোমাদের ফুলের বাগানে
ভ্রমরের বড় উৎপাত;
কতিপয় বোলতাও আছে
ভয়ে তাই নিয়েছি তফাত।

ভ্রমরের গুনগুন ভাল
ভ্রমরের হুল ভাল নয়।

তোমাদের চতুরালি যাহা
আমার তা প্রাণ সংশয়।

বেয়াদব বোলতাগুলোর
ফেরঙ্গদেশি লাফঝাঁপ।
তার চেয়ে ভাল ভ্রমরের
মাইকেলি আত্মবিলাপ।

তোমাদের ফুলের বাগানে
একটি তো মোটে ফোটাফুল,
অতগুলো পতঙ্গ সেখানে
কী রসে সদাই মশগুল ?

ভ্রমরের গুনগুনই সার
বিধি জানে বোলতার গতি !
তোমার বাগানে, শতদল,
কোন্ পথে যাব, প্রজাপতি ?

স্বগত

মেয়েদের ভালবেসো না, মন,
প্রাপ্তি তো শুধু যন্ত্রণাই।
চটুল আঁখির ছলাকলায়
বীজাণু জটিল হৃদ্‌রোগের।

পিছনে জটিল হৃদ্‌রোগের
কান্নার ঢেউ বন্যা ঝড়।
বুঝবে কি রাজকন্যে কেউ
কেন থরোথরো অশ্বক্ষুর ?

কেন থরোথরো অশ্বক্ষুর
দূরত্ব যদি সামান্যই ?
নীলাকাশে মেঘচিহ্ন নেই
তবু কেন এই মত্ত ঝড় ?

শুধু লেলিহান মত্ত ঝড়
প্রমীলারাজ্যে বৃষ্টি নেই।
উজ্জীবনের মন্ত্র ভুলে
শেষে বনবে কি পৌত্তলিক ?

সেই হবে যদি পৌত্তলিক
যাও নাকো কেন কামাখ্যায় ?
আত্মপীড়নে আরাম চাও ?
পাবে যৌগিক কসরতেই ।

খোঁজো যৌগিক কসরতেই
শরশয্যার ভীষ্মসুখ ।
অপৌরুষেয় যন্ত্রণায়
মেয়েদের ভালবেসো না, মন ।

সকাল

এখন সূর্যের রঙ লাল
সদ্যোজাত বিমর্ষ সকাল
নির্জন ময়দানে ।
এইমাত্র আর্যবির্ত থেকে
একহাঁটু ধুলোকাদা মেখে
থামলুম এখানে ।
ঘুমের সুন্দরবনে বাঘ
রেখে গেছে রক্ত অনুরাগ
বিক্ষত সকাল এ ।
রূঢ় সমালোচকের নাক
একচক্ষু শীর্ণ দাঁড়কাক
বটের আবডালে ।
বয়োতীত বিশুষ্ক হলুদ
ছিঁড়েখুঁড়ে নাস্তানাবুদ
কই তবু শিকড় ?
মৌরসিপাট্টায় আজও হুন
খাস করে রেখেছে ফাল্গুন,
অনাগত ঝড় ।
পরিশ্রান্ত একচক্রযান
ধূলিরুক্ষ খাঁখাঁ হিন্দুস্থান
রাতভোর ঘুরেছি ।
ভাঙা হাঁড়ি, বেকার লাঙল
চোখগুলি তবু জ্বলজ্বল
আগুন-ও দেখেছি ।
হে আকাশ, অন্ধ হয়ে যাও
মেঘে মেঘে বজ্রকে জাগাও
ঝঞ্ঝার উত্তালে ।

ঘুমের সুন্দরবনে বাঘ
রেখে গেছে রক্ত অনুরাগ
বিক্ষত সকাল এ।

বেকার

ছোট্ট নিস্তব্ধ এই ঘর
বর্ষার ক্লান্ত দ্বিপ্রহর
মলিন ধোঁয়াটে।
কাজ নেই আমি বেকার
তোমার করাতে কী ধার
দিনরাত কাটে।
হে সূত্রধর, বলি শোনো
তুমি কাটছ কিন্তু কোনো
কিছু গড়ছ না।
কিছুই হচ্ছি না আমরা
কিছুই পাচ্ছি না আমরা
অবিরাম ঝরছে মরা
মুহূর্তের কণা।
অসংখ্য মুহূর্তের কণা
তুমি কিছুই গড়ছ না
ওহে সূত্রধর।

ভয়

কে এক আবছায়া যেন
সব সময় আমার চারদিকে।
ভয়—কী দারুণ ভয়ে
মুখের চামড়ার রঙ ফিকে।

হৃৎপিণ্ড থত্থর আমার।
পথ নেই পালিয়ে যাবার
ওই দুই আঁখিতারকার
নাতিদূর স্বপ্নের অলীকে।

অহরহ অনিশ্চয়তায়
বেঁচে থাকা বেঁচে না-থাকায়
বন্দি হয়ে অদৃশ্য খাঁচায়
বিদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণমুখ শিকে

ছ'তলার কুঠুরিতে যাব ?
রবীন্দ্রনাথের গান গা'ব ?
সুখী উপন্যাসেই কি পাব ?
পাব না বা গানের গলিকে।

এই ভয় সাপের শরীর
এই ভয় শীতের হি-হি-র
চেয়েও ঠাণ্ডা শাদা
মূর্ছা তার স্পর্শের ক্ষণিকে।

কে এক আবছায়া যেন
সব সময় আমার চারদিকে।

চৌরঙ্গী—১৯৪১

না, না, মূর্খ এই আশাবাদ !
পাথুরে কঠিন মাটি
কে করে আবাদ।

এখানে রাতেরও নেই ডানা
কাঁটাগাছ বিছানো বিছানা।
দিনের দুর্দান্ত ঝড়ে
ধুলো ওড়ে, বাজ পড়ে,
ভুলে যাই নিজেরই ঠিকানা।
এখানে রাতেরও নেই ডানা।

অসহ্য অস্থির কী-যে ব্যাধি !
সমস্ত ধারণা, ধ্যান
বিচলিত খানখান
ছিন্নভিন্ন আসন, সমাধি !
বিক্ষিপ্ত দেহ ও মন
প্রাণায়াম বিড়ম্বন,
কী হবে বালুর বাঁধ বাঁধি ?
অসহ্য অস্থির এই ব্যাধি।

অসংখ্য দ্বন্দ্বের মাঝে সাঁকো
কে তুমি ? উত্তর মেলে নাকো।
চূর্ণ চূর্ণ ধূলিকণা

খুঁজেছি, কোথায় সোনা ?
সিঁড়ি নেই। নেই কোনো বাঁক-ও।
আদিগন্ত থৈ থৈ। নেই নেই সাঁকো।

গজভুক্ত, চৌরঙ্গীতে ঘুরি ;
যা ছিল সর্বস্ব গেছে চুরি।
ওরে উদ্‌ভ্রান্ত মন
এ-যে ফণিমনসার বন,
ব্যর্থ উটপাখির চাতুরী।
অর্থহীন এয়োতির নোয়া
নিঃশেষিত অন্তর-মাধুরী।
যা ছিল সর্বস্ব গেছে চুরি।

তবু মূর্খ কেন আশাবাদ।
পাথুরে কঠিন মাটি
কে করে আবাদ !

কোনো উদ্বাস্তু মেয়েকে

হে ছলনাময়ী, কত চতুরালি জানো
অপ্রস্তুত আকাশে বজ্র হানো।
বহুপূর্বেই কন্দর্পের সাজ
ছেড়েছি, দীনাতিদীনকে দিয়ো না লাজ,
অন্তত, দেশকালপাত্রটা মানো।

প্রাক্‌-নিদ্রার অবকাশে উৎসুক
আঁধি থেকে ছিঁড়ে এনেছি তোমার মুখ।
ভ্রান্তিবিলাস এত অমার্জনীয় !
কঠিন আঘাতে সচকিত ইন্দ্রিয়
গুরুদায়িত্বে কাড়ো ক্ষণিকের সুখ।

বাক্যে আমার ক্রিয়াপদ ছিল না তো ;
কামনারা ছিল ভাবনারই উপজাত।
কেন টেনে এনে নামাও দুরূহ কাজে
ফেনসমুদ্রস্রোতাবর্তের মাঝে ?
কেন দু'নয়নে প্রত্যাশা বিখ্যাত ?

খুঁজিনি, দোহাই, নিলাজ ও-নগ্নতা ;
কাম্য জেনেছি বাদুড়েরই অন্ধতা।

সংশয়ে ভয়ে মধ্যবিত্ত জ্বরে
বেঁধেছি রাতের নিরাপদ বন্দরে
শত নিরাশার অবোধ অবাধ্যতা।

হে ছলনাময়ী, বিমূর্ত উদ্বেগ !
কুন্তল-কালো কালবৈশাখী মেঘ,
স্রস্ত বসন উন্মাদ অরাজক,
দীপ্ত মুঠিতে গুপ্ত শাণিত নখ !
যায়—যায় বুঝি আমার রুদ্ধবেগ !

দোলাচলে হতচকিত আমি তা জানো
কেন এ-সুশীল আকাশে বজ্র হানো।

ডত্তরবসন্ত

গোয়েন্দার চাকরি গেছে। বহুদিন লেকাঞ্চলে আর
ঘুরিনি রহস্যময়ী হৃদয়কে করতে গ্রেফ্‌তার
বর্ণালী শাড়ির ভিড়ে সৌগন্ধ্যের গোলকধাঁধায়
চৈতালী পূর্ণিমা রাত্রে কায়াহীন ছায়ার পাড়ায়।

তস্কর ইচ্ছারা বন্দী। দুরাকাঙ্ক্ষা হয়ে গেছে ঢিট্।
গোয়েন্দার চাকরি গেছে, ডেরা আজ ক্লাইভ ইস্ট্রিট্।
লেজারে গোলমেলে অঙ্ক, ক্যালেন্ডারে মাসের পঁচিশ
চেয়ে দেখি জনতারে রুখে দেয় ট্রাফিক্ পুলিশ।

কত-যে অসংখ্য লোক ছুটে আসে ! আত্মবিশ্বাস
নাকানি চোবানি খেয়ে হয়ে যায় ক্রমশ শিথিল।
অন্ধ ডোবায় তারা অনিশ্চিত ফাতনা ভাসায়
অবলীলাক্রমে যারা পেরিয়েছে নদী খাল বিল।

এই তো সেদিন সারা পৃথিবীটা ছিল ক্রীতদাস :
দার্শনিকতার বাণী শুনেছিল পার্কের ঘাস
তুখোড় আড্ডায় কত দুঃসাহসী যুবকের মুখে
কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গে দুর্যোগের ঝঞ্ঝার সম্মুখে।

হয়ত এ-ট্রাজেডির মূলে আছে বণিকের পুঁজি।
কর্কটক্রান্তির চক্রে এ-দেশের অশুভ ঠিকুজি ?
স্বল্পায়ু যৌবন তবু পতঙ্গের মতন শৌখিন।
আহা সে এলাহি রাত আর সেই অপরূপ দিন !

স্বেচ্ছাচারী আকাঙ্ক্ষার দিগ্বিজয়ী সেই ঘোরাফেরা।
নিষিদ্ধ এলাকা লেক হুঁশিয়ারি কাঁটাতারে ঘেরা।
গোয়েন্দার চাকরি গেছে। কোনোদিন লেকাঞ্চলে আর
ঘুরব না রহস্যময়ী হৃদয়কে করতে গ্রেফ্‌তার।

অগ্রহায়ণে

কোনোই আনন্দ নেই অগ্রহায়ণে
কলকাতার সন্ধ্যায় ধোঁয়ায় ধূসর মনে।
কেবল সান্ত্বনা এই তুমি আছ আর মৃত্যু আছে
রাত্রির অস্পষ্ট ঘ্রাণে প্রত্যাশায় রক্ত তাই নাচে।

আর সব অর্থহীন। অবচীন হাসির দাঙ্গায়
ক্ষণিক তরঙ্গ তুলে নিথরিত জমাট হাওয়ায়
যারা চলে গেল, তারা
উদ্‌ভ্রান্ত ইশারা।

প্রায়ান্ধ গ্যাসের আলো। আর এই গলিটা নির্জন।
সুদীর্ঘ দেয়াল জুড়ে ভারাক্রান্ত ভারতের মন :
লাল নীল রঙিন পোস্টার
আর অন্ধকার।

কার্নিশের টবে যদি অকস্মাৎ ঝঞ্ঝা নেমে আসে
নির্বোধ ইচ্ছারা যদি উচ্চারিত উদগ্র উল্লাসে
ক্ষেপে ওঠে, তবে হালখাতা ?
ছাই, শালপাতা।

এবং ইঁদুর আজো ক্রীড়নক অন্ধ প্রকৃতির।
কোনো ধ্রুবতারা নেই মানুষের অভিব্যক্তির ?
ঘাম আর রক্ত আর ব্যর্থ অঞ্জলি
কী দীর্ঘ এ-গলি।

আবার তির্যক আলো। আলো কেন ? দূরে কারা যায় ?
কয়েকটি নৌকো যেন কৃষ্ণপক্ষে দুরন্ত পদ্মায় :
কখন যে কাছে এল, কোনখানে হারাল যে খেই
আমাদের জানাশোনা নেই।

যা-কিছু উজাড় করে একমুঠি বালুকাকে কেনা
এ-বিবিক্ত সন্ধ্যা আর ভাল যে লাগে না ।
কেবল সান্ত্বনা এই তুমি আছ আর মৃত্যু আছে
রাত্রির অস্পষ্ট ঘ্রাণে প্রত্যাশায় রক্ত তাই নাচে ।

একটি ছবির আত্মকথা

আমার শরীর নেই । শুধু এক আকণ্ঠক্ষুধিত
লোলচর্ম দন্তহীন অতিবৃদ্ধ ভ্রূকুঞ্চিত মন
প্রতীক্ষার দীর্ঘতায় প্রায়শেষ রজনী যখন
খণ্ডিতা নারীর মতো ধূল্যবলুণ্ঠিত ।

আমার শরীর নেই । তবু ঘেরে মাংসল কামনা !
নিশিগন্ধাশিহরিত প্রেম নয়, প্রেম তাহা নয় ।
উচ্চারিত হৃদয়ের অপরূপ অসহ বিস্ময়
নয় তাহা, যাহা পাই প্রেম তাহা নয় ।

আমার শরীর নেই । কত চোখ লালসাপীড়িত
অশ্লীল কটাক্ষ হেনে চলে যায়, কাছে ঘেঁষে আসে
বালকবৃদ্ধযুবা লুব্ধ আঁখি নিরুদ্ধ নিশ্বাসে :
তারা কি আমাকে কেউ... কেউ ভালবাসে ?

জার্নাল থেকে

(১)
যতদিন পাইনি তোমাকে
ছিলে দূর আকাশের পাখি ।
চাওয়া আর পাওয়ার ঘুরপাকে
নেচেছিল আঁখি ।

কেন এলে নীচে তরুশাখে ?
শোনোনি কি খাঁটি কথাটাকে :
যা থাকে তা মনেতেই থাকে
আর সব ফাঁকি ?

(২)
বৃষ্টিভেজা বাড়ির মতো রহস্যময়
তোমার হাতে আছে আমার একটু সময় ।

কত দিনের কত রাতের ঝাপসা তুলির
রঙে রেখায় আঁকা আমার একটু সময়।

(৩)
ব্যর্থ হবই। তাই এই ভালবাসা
এত করুণ, এত মধুর!
ব্যর্থ বা কেন? প্লেটোকে পেয়েছি পাশে।
তুমি পবিত্র পদ্ম, বিয়াত্রিচে।

অনেক ঘুরেছি নীল আকাশের নীচে।
খুঁজেছি তোমাকে বিকেলবেলার ঘাসে।
তুমি সুদূর, ক্লান্ত সুর,
তাই মধুর যাওয়া আসা।

(৪)
আমাকে সুন্দর করো, সে যে ভালবেসেছে আমায়!
পরিশুদ্ধ হোক বায়ু; আকাশ প্রশান্ততর হোক।
আমার হৃদয় ভরে দাও শুভ্র নির্মল আলোক।
আমাকে পবিত্র করো সুরভিত অপরাজিতায়!

ক্ষণিকা

পৃথিবী অদ্ভুত তাই অন্ধকার হতে তুমি নারী,
আলোর সহস্রশিখা হয়ে দিগ্বিদিকে
উন্মত্ত আশায় ভীরু ধমনীর প্রতিধ্বনিকে
শূন্যতায় সঞ্চারিত করে দিলে। এই তরবারি
এবার তোমার প্রাপ্য। এ-রক্তের নেশা
দুর্বিনীত রিরংসায় তরঙ্গের রভসিত হ্রেষা।

তারপর স্বপ্ন শেষ। কিন্তু কোনো ছায়া নেই মনে।
যেন আমি শ্লথচক্র কবোষ্ণ ফিটনে:
যেন আমি ময়দানের কুয়াশাকে দীর্ণ করে
রেড রোড্ থেকে চৌরঙ্গীর
মুগ্ধতার মৌতাতে স্থবির।
এবার তো বরাভয়। এবার তো কৈলাশের তুরীয় বিষাদে।

তারপর কুম্ভীপাক প্রত্যহের নরকের খাদে।
পুনরায় অন্ধকারে বিলীন বিবর্ণ তুমি, নারী।

ডিসেম্বর

না। এপ্রিল এল না।
দীর্ঘসূত্রী মাঘ। মনে হয়
এ-খণ্ড নাটকে নেই
কোনো আধিদৈব বিস্ময়।

এই পথে চাঁদ কৃশকায়
এই পথ ছায়াবিক্ষত ;
কামনাকরুণ দিনগুলি
নতমুখ স্বপ্ননিহত।

তোমার মৃত্তিকা, নারী,
ব্যবহারযোগ্যই কেবল।
মৃন্ময় মায়াবী কলসে
সময়ের সাগরের জল।

এই অভিজ্ঞানে কই
যন্ত্রণা হল না অবসিত।
এই পথে আমি তাই ক্রেতা
এই পথে আমি বিক্রীত।

ঘুম

কেটেছে সমস্ত দিন অনাত্মীয় রুক্ষ পরিবেশে
হে রাত্রি, মিনতি শোনো, মিত্র হও, কটাক্ষ হেনো না।
ঘুম, শুধু ঘুম দাও, নিয়ে যাও সেই নিরুদ্দেশে
যেখানে স্মৃতির শব অন্ধকারে আগাগোড়া বোনা
স্থূল আস্তরণে ঢাকা ; দুপুরের দিঘির মতন
আমার সমগ্র সত্তা মৃত্যুমগ্ন নিস্পন্দ নির্বাক :
নেই, নেই, কিছু নেই ; নেই, নেই এই দেহ মন ;
প্রত্যহের ভ্রূকুঞ্চন, নিরানন্দ কুকুরের ডাক
আর দূর আকাঙ্ক্ষার বক্ররেখা অপ্রতিভ নদী।
স্বপনের সরোবরে বিকশিত শ্বেতশতদল
দূরে থাক, পড়ে থাক। স্মৃতিহর ঘুম পাই যদি
ভেসে যাই, ডুবে যাই, মুছে যাই অগাধ অতল।
হে রাত্রি, মিনতি শোনো, প্রিয়তম, অনুকম্পা করো,
বিনত শরণাগত থরোথরো দেহ তুলে ধরো।

ক্রিসান্থিমাম

ভালবাসা তুমি সুদূর শঙ্খচিল
অনেক দূরের নীলে।
আজ মনে হয় হয়তো বা নয় ভুল
হয়তো বা ডেকেছিলে।

সেদিন হৃদয়ে অঝোর বৃষ্টিধারা
শুনতে পাইনি তাই দিইনিকো সাড়া
শুধু অনুমানে অভিমানে দিশাহারা
দুয়ারে এঁটেছি খিল।

তখনও অনেক আসামানি নীল খামে
জড়িয়ে রয়েছে মোর নাম তার নামে,
ব্যথাবিজড়িত পীত ক্রিসান্থিমামে
রূপকথা ঝিলমিল!

বিরচিত ভুলে তবুও দিয়েছি তালি,
সবুজ ঢেকেছে বিরস মরুর বালি।
কত আকাঙ্ক্ষা-ক্ষুব্ধ উর্মিমালী
অবসাদ পঙ্কিল

দিঘির কালোয় ধিক্কৃত মৃত্যুকে
মেনে নিয়ে বাঁধ বেঁধেছে নিজের বুকে।
মুছেছে সময় ঘুমের গহনে ঢুকে
স্বপ্নের শাদা তিল।

বিকেলে নীরব সব কলরব যবে
কার কালো চুল ভেসে এল সৌরভে!
এ কি সেই ফুল—কী ভীষণ ভুল—তবে
কোথায় ছুঁড়েছি ঢিল!

হায় ভালবাসা সুদূর শঙ্খচিল!

জুহু

ছেড়ে দাও হাল
শিকারের পাবে না নাগাল
এসো এইখানে।

প্রবঞ্চক দিন
প্লুতগতি সুবর্ণহরিণ।
রাত্রি শুধু জানে
অন্ধকারে অশ্রুই সম্বল।

ঝিকমিক রোদ
মুঠি মুঠি সোনালি আমোদ
সমুদ্রের গানে।
স্তব্ধ হোক লুব্ধতার হাত
শেষ হোক স্বপ্নভাঙা রাত
এসো এইখানে।

মালাবার কাঁপে থরথর
আরব্যসাগর
দুরন্ত প্রেমিক।
মেঘনীল সামুদ্রিক পাখি।
গান করে রৌদ্রেতে একাকী
তরঙ্গ নির্ভীক।

এই কলরব
কালত্রয়াবাধিত বাস্তব
জঙ্গম স্থবির।
ওরে দূর পলাতক মন
সান্তেই অনন্ত জীবন।
মেখে নে আবির।

ঝিকমিক রোদ।
শেষহীন সোনালি আমোদ
সমুদ্রের গানে।
ছেড়ে দাও হাল
শিকারের পাবে না নাগাল
এসো এইখানে।

দূরের আকাশ

কেমন যেন করুণ যেন
সুদূর স্নেহপ্রীতি
বিগত দিন বিগত রাত
শিশিরভেজা স্মৃতি।

কার সে আশা ভালবাসার
চোখের নীল আলো
ছড়িয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়ে
হীরে ঝলমলাল।
রঙের ঝিল আবছা নীল
মধ্যিখানে তার
একটি তারা হঠাৎ জেগে
উধাও পুনর্বার।
একটি তারা নয়নতারা
কার সে হৃদয়ের ?
অনেক দূর—অনেক দূর
দূরের আকাশের।

বৈশাখী

তোমাকে চাই আমি, তোমাকে চাই
তোমাকে ছাড়া নেই, শান্তি নেই ;
রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও
আমার বৈশাখী রাত্রিদিন।

রভসে দাউদাউ সমুদ্রের
শরীরে পাকেপাকে ফস্‌ফরাস্‌ ;
অন্ধকারে চুল এলিয়ে দাও
নখরে নীল হোক শুভ্র বুক।

তোমাকে চাই আমি, তোমাকে চাই :
হেঁকেছে অস্থির অশ্বক্ষুর ;
জ্বলেছে পদেপদে বিদ্যুতের
তীব্র শব্দের আর্তনাদ।

তোমাকে ছাড়া নেই, শান্তি নেই
গোলাপফুল আমি ছুঁয়েছি ঢের ;
রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও
আমার বৈশাখী রাত্রিদিন।

শান্তিনিকেতন থেকে
(অশোক মিত্র-কে)

সে-কোন্ নারীকে আমি ভালবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি
কঠিন অসুখে ভুগে ? কাঁপে একেশিয়ার শরীর
ছায়ায় কাঁকরে পথে রতনকুঠিতে জ্যোৎস্নায় ।
কেউ জেগে নেই আর । কেউ নেই । খোয়ায়ে প্রান্তরে
শীতের কুয়াশা স্থির প্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথের ।
হঠাৎ বাতাস আসে । থেমে যায় । কাঁপে, রাত্রি কাঁপে ।
সে-কোন্ নারীকে আমি ভালবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি ?

সে-নারী কবিতা ? কথা ? অশরীরী শব্দের ব্যঞ্জনা ?
হয়তো । অস্পষ্ট সব । শান্তিনিকেতনে জ্যোৎস্নায়
সমস্ত বেদনা দুঃখ কান্না শোক কথা-শরীরিণী
রবীন্দ্রনাথের গানে । তাঁর দিগ্‌বিস্তৃত চেতনা
খোয়ায়ে প্রান্তরে দূরে কাছে একেশিয়ার শরীরে
আমার হৃদয়ে ব্যাপ্ত, সঞ্চারিত স্নায়ুতে স্নায়ুতে ;
সে-কোন্ নারীকে আমি ভালবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি ?

রবীন্দ্রনাথ

'কিন্তু আনন্দ কোথায়,' বুদ্ধদেব বসু বললেন,
'য়ুরোপের আজকের কবিতায় কিংবা উপন্যাসে ?
রবীন্দ্রনাথকে দ্যাখো, কী উজ্জ্বল প্রশান্ত বিশ্বাসে
জীবন শাশ্বত জেনে মানুষকে ভালবেসেছেন ।
দুর্ভাগ্যত, এদেশেও নষ্টনীড় হালের কবিরা ।
সমর অস্থিরচিত্ত ; শ্লেষাশ্রয়ী তরুণ সুভাষ ;
সুধীন্দ্রনাথেও নেই অগ্রজের অটল বিশ্বাস ।
রবীন্দ্রনাথকে দ্যাখো সময়ের সংক্রামক পীড়া
ছোঁয়নি । আশিতে ছিল মজবুত মেরুদণ্ড তাঁর ।'

'দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা নেই,' প্রত্যুত্তরে আমি জানালুম,
'রবীন্দ্রনাথের কাব্যে । যত পরিপার্শ্বের জুলুম
সব যেন মিথ্যে, বাজে । যে-জীবন প্রাত্যহিকতার
ঘামে রক্তে পাংশুবর্ণ তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের
যোগ কই ?'

'মানব না ভ্রান্ত এই যুক্তি তোমাদের ।
যত ক্লেদ যত গ্লানি যত নোংরা আবর্জনা যত

নর্দমা ইজারা নিয়ে বসেছেন ঝাড়ুদারব্রত
য়ুরোপের সাহিত্যিক। শঙ্কিত সর্বদা পাপবোধে
খ্রিশ্চানি নরককুণ্ডে আদম-ঈভের ঋণ শোধে
সাহিত্যের কুশীলব। এরা কিছুতেই সত্য নয়,
যে-সত্যে প্রতিষ্ঠা হয় সাহিত্যের অম্লান অক্ষয়
নরনারী। সবথেকে শোচনীয় আর আক্ষেপের
কথা এই : বিষয়ীরা শৃঙ্খলিত সৃষ্ট বিষয়ের
পাপচক্রে। স্বাধীনতা হারিয়েছে শিল্পী-সাহিত্যিক।
পক্ষান্তরে, মঙ্গলের আনন্দের মুক্তির প্রতীক
রবীন্দ্র ঠাকুর যেন।'

'ভালমন্দ সদসদ্‌ভেদ
না-থাকায় ক্ষতি কিছু হয়নি কি তাঁর রচনার ?
রবীন্দ্রের উপন্যাসে কই সেই যন্ত্রণার স্বেদ
যদ্দ্বারা চিহ্নিত হলে মনে হবে আত্মীয় আমার
কাল্পনিক নরনারী ?' প্রতিবাদে আমি প্রশ্ন তুলি।

'এই অভিযোগ কিন্তু, যাই বলো, নেহাত মামুলি,'
বুদ্ধদেব বসু তাঁর ষষ্ঠতম সিগারেটটাকে
জ্বেলে নিয়ে বললেন। 'ট্রাজেডির বোধ বলে যাকে
তা তো নেই পুরাতন সংস্কৃত নাট্যেও ; নেই শীত
সংশয়ের। মনে হয় সাহিত্যের এখানেই জিত।
ভাল নয় মন্দ নয় দ্বন্দ্ব নয় দ্বিধা নয়, শেষে
আনন্দ আনন্দ শুধু আনন্দবেদনা সেই দেশে।'

অনেক গভীর রাত্রে আড্ডা ভাঙে কবিতা-ভবনে।
ট্রাম-বাস বন্ধ। চাঁদ। হেঁটে ফিরি। আলোছায়া দোলে
সহসা শুনতে পাই : 'ভাবনা আমার পথ ভোলে।'

সংশয়বিমুক্ত চিত্ত ; তাঁর স্থান তর্কাতীতে, মনে।

শোনা কথা

(১) দোজবরের খেদ

"ত্রিভুজের যে-কোনো দুটি বাহু
একত্রে তৃতীয় বাহুটির চাইতে বড়ো !
রেখে দাও তোমার জ্যামিতিক সত্য !

মরা আর জ্যান্ত আমার দু-দুটো বৌয়ের চাইতে
রাস্তাঘাটের যে-কোনো একটি মেয়েই যথেষ্ট ।"

(২) কিমাশ্চর্যম্

"গিরগিটি দেখেছ ? বাঘ ?
উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য আছে কি ? নেই ।
তবু দুটো জানোয়ারকেই ভয় করো তুমি, কী আশ্চর্য !
আশ্চর্যই বা কী করে বলি ?
রাত্রি তোমার চুলের মতো কালো
দিন তোমার দাঁতের মতো শাদা ;
অথচ রাত্রেও নয়, প্রভাতেও নয়, নিরেট
গোধূলিলগ্নেই তোমার প্রেমে পড়েছিলুম ।"
শেষরাত্রে সেই নাবিক আর এক পেগ্ হুইস্কি চাইল ।

(৩) সোস্যাল্ কন্টেক্স্ট্

"রিকশায় বাক্স-বোঝাই মন :
যাঁরা চিন্তা করেন, ডিম পাড়েন, কিন্তু ডিম পেড়ে
আর চিন্তা করেন না, তাঁদের, সেই দায়িত্বজ্ঞানহীনদের ।
মণ দরে মন বিক্রি হবে নিলামে জ্ঞানের আড়তখানায় ।
কিন্তু ঠোঙা গড়লেই বা ক্ষতি কী ?" জঙ্গি ছাত্রনেতা বললেন ।
"সবই তো বেচাকেনা, মুনাফা । কেবল, বন্ধুগণ,
কেবল চাকার কাতরানিটাই সত্য ।"

দুঃখজাগানিয়া

দেব না সাড়া আর স্মৃতির নিশিডাকে
আমাকে ডাকো কেন দুঃখজাগানিয়া ?
মায়াবী মসৃণ মরমে মোহনিয়া
ও কারুকার্য কি বিদেশি লাইলাকে ?

ও শুধু ঝিলিমিলি । কে ভোলে ছলনায় ।
রাতের বাতাসের বেদনা টলোমল ।
শূন্য শব্দের ছিন্ন ভাবনায়
ভোরের শিশিরের বুকের ছলোছল ।

কোথায় কোন্খানে ? কোথায় সেই রাত ?
ধূসর ধুলো ওড়ে ছিন্ন ভাবনায় ।

এই কি তার মুখ ? এই যে তার হাত ।
ও শুধু ঝিলিমিলি । কে ভোলে ছলনায় ।

সে ছিল জেগে, তবু ওঠেনি শিহরিয়া ।
কে দেবে সাড়া বলো স্মৃতির নিশিডাকে ?
সে নদী হতবাক আলোর শেষ বাঁকে ।
আমাকে ডাকো কেন দুঃখজাগানিয়া ?

যাও, উত্তরের হাওয়া

সূচিপত্র

দিঘা

জলপিপি রেখে গেছে উজ্জ্বল পালক
বালিতে জরির পাড় বোনে
জগদ্‌বিখ্যাত শিল্পী সন্ধ্যার আলোক
আপনার মনে।

আকাশের মাঠ থেকে হাওয়ার রাখাল
তাড়া করে নিয়ে আসে কালি,
নারঙ্গতরঙ্গভঙ্গে সমুদ্র বিশাল
দেয় করতালি।

আনন্দবিস্মিতভয়ে বিমৌন স্থবির
এই ভাল, যাব না পিছনে।
সেখানে লম্বিত ছায়া, দিনের শরীর
ক্ষীণায়ু লণ্ঠনে।

অর্থাৎ, ব্যস্ততা ভারী, হিসেবনিকেশ
সময়ের রাজত্ব শৃঙ্খলা,
জটিল কুটিল অঙ্ক, চতুর সুবেশ
শুদ্ধ কারুকলা।

জলপিপি রেখে গেছে উজ্জ্বল পালক
যদি ফিরে আসে পুনরায়
বলব : 'আমাকে দাও দূরের আলোক,
দেবে না আমায় ?

যেহেতু তোমার পাখা ভাবনার মতো
উড়ে যায় হাওয়ায় সহজে
আমার শরীর মন চেতনা সতত
তোমাকেই খোঁজে।'

আকাশকুসুম

আকাশকুসুম, তুমিই আমার সুখ
এই রঙ, এই ঢঙ বদলাও ব'লে।
সম্ভাবনার গন্ধে ভরাও বুক
শহর যখন নিষ্ঠুর পায়ে দলে
বকুল ফুলের স্পর্শকাতর দেহ।

অপেক্ষা করো দয়ার্দ্র সন্ধ্যাতে
ঠিক সেইখানে, যেখানে তোমাকে চাই।
নগরপালের দৃষ্টির এলাকাতে
আমরা দু'জনে গোপনমিলনে যাই
রচনা করতে নীরবনিবিড় স্নেহ।

এবং কুয়াশা-মশারি চতুর্দিকে
ম্লান জ্যোৎস্নার সুদূরমেদুর হাসি
অর্থগভীর অস্ফুট আর ফিকে
যে-সব শব্দ ভালবাসে, ভালবাসি,
যে-সুর ক্লান্ত প্রেমিকজনের প্রেয়।

আকাশকুসুম, আমাদের যৌবন
শরৎকালের ভোরবেলাকার মতো।
সময় করেছে দেহ ক্ষতবিক্ষত
মন তাকে তবু করিনি সমর্পণ।
যা কিছু দেবার তোমাকেই সব দেয় ॥

অশেষ

যৌবন যায়। যৌবনবেদনা যে
যায় না। সহসা ব্যাকুল বিকেলে বাজে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাত সাগরের দোলানি।
চেনামুখ আর দেখায় না কফিখানা ;
নূতন শহর, পথঘাট নয় জানা,
বন্ধুরা মৃত, অপরিতৃপ্ত, গোঙানি।
তবু মূলে মূলে কার আঙুলের দোলানি।

নবীন যুবক, বিদেশি তোমার ভাষা।
যুবতী, হৃদয়ে রেখেছ তো ভালবাসা ?
আমরা ছিলাম গত দশকের শিকলে।
মিছিলে সভায় আকুল সন্ধ্যাগুলি
যুদ্ধে, আত্মহননে গিয়েছে ভুলি
স্বাভাবিকতার কথিত সহজ সরলে।

শুধু পথ খোঁজা। দ্বন্দ্ব ডাইনে বাঁয়।
জারুল বকুল অবাক কলকাতায়
মাঝে মাঝে তবু হেসেছে চটুল নয়নে।

সেই নিমেষের অশেষ উত্তরীয়
সব রমণীকে মনে হত রমণীয়
জাদুকরদের মেলা বসে যেত স্বপনে।

যদিও রঙিন মুহূর্তটুকু অচিরে
অদৃশ্য ফের দুর্ভাবনার তিমিরে
যেখানে অর্ধসত্য ছলনা চাতুরি,
বুঝেছে অনেক গভীর রাতের মন
সেটুকুই ছিল আমাদের যৌবন
বাকিটুকু শুধু সময়-প্রভুর চাকুরি।

যুবক-যুবতী গুঞ্জন কলরব
হঠাৎ খুশির বেদনার সৌরভ
এনেছ আবার এ-কোন ভোরের কুয়াশা।
যৌবন যায়। যৌবনবেদনা যে
যায় না। সহসা ব্যাকুল বিকেলে বাজে
মূলে মূলে কার বাসনাকরুণ দুরাশা।

প্রতীক্ষা

প্রতিধ্বনি ঘোরে কক্ষে কক্ষে :
কে আছ ? কেউ আছ ? কেউ কি নেই হে ?
এখানে কেউ নেই : শব্দ গন্ধ
স্পর্শ দৃশ্যের অতীতে কেউ না।
সবাই ভৌতিক ॥

যদি না ঈশ্বর পাষাণ মূর্তি
অথবা মৃন্ময়ী মানুষী মর্ত্য,
তা হলে নিরাকার অসীম শূন্য
হাওয়ার চিৎকার ; তা ছাড়া, কিছু না।
স্বপ্ন প্রলাপীর ॥

আমার ঈশ্বর শুদ্ধ শিল্প
গড়নে অপরূপ, ভাবনে মুগ্ধ ;
গৌরীহর সমভঙ্গভঙ্গি
জৈব জীবনের নৃত্য, ছন্দ।
রক্তে ঢেউ যেন ॥

মানবসংসার ঈর্ষা দ্বন্দ্বে
অভাবে অবিচারে ভগ্ন কক্ষ ।
কবে, হে ঈশ্বর, আমার মুক্তি
তোমার রচনায় মুখর মৌন !
বিফলে দিন যায় ॥

হাওয়া

পুরনো বন্ধুরা যত স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে
দিল্লির সুদূরে, কেউ বোম্বায়ের সমুদ্রের কাছে ।

কলকাতার অন্ধকারে হাঁক ছাড়ি ; এখানে এসো হে
ফিরে এসো আমাদের যৌবনের যুবতীর মোহে ।

দিল্লির ব্যস্ততা আর বোম্বায়ের নাভিশ্বাস নিয়ে
দু'লাইন চিঠি আসে যথারীতি ইনিয়ে বিনিয়ে

আর যে সময় নেই, এই কথা বড় খাঁটি কথা ।
ও হাওয়া, ব্যাকুল হাওয়া, কেন তোর বকুনি অযথা !

মাথুর

ও প্রেমিক, তুমি কোথায় যাচ্ছ, শোনো,
অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছি তোমায় দেখব বলে ।
দ্যাখো কত ভিড় জমেছে পথের পাশে, বারান্দায়,
মধ্যিখানে আমিও আছি, আমাকে দেখবে না ?
দ্যাখো আমায়, দ্যাখো, প্রেমিক, কাতর আমার মুখ
একতরফা ভালবাসায় মন যে ভরে না
এই যে আমি, আমায় দ্যাখো ।

ওদের হাতে মালা, প্রেমিক, আমার শূন্য হাত ;
ওরা রঙের ঢেউ তুলেছে, আমি ছিন্নবাস ।
কিন্তু ওরা ভিড়ের, ওরা তোমার কেউ না ।
আমি তোমার, তোমার শুধু, আমি তোমার ।

আমি তোমায় ভালবাসি, প্রেমিক, আমায় দ্যাখো ।
হৃদয় জুড়ে গন্ধ আমার, পূর্ণ আমার প্রাণ,
বুকের মধ্যে টকটকে লাল রঙ ।

ওদের শুধু দেখতে আসা, ভাসতে আসা নয়।
এই যে আমি রুদ্ধ জোয়ার, প্রেমিক, আমায় নাও

খড়খড়ি

মনে মনে বলি স্বপ্নক্লান্ত দিনে :
ঘোরঘনঘটা দুর্যোগে নেব চিনে
বহুদিনকার হারানো অন্ধ গলি,
দু'পাশে প্রাচীন গৃহের একটি ঘরে
শিহরিত খড়খড়ি।

দীর্ঘ রাতের বিরহান্তিক মিলে
দৃষ্টি পাবে না অভিন্ন আশ্লেষ ?
অমাবস্যার অন্তিম সঙ্গমে
শান্ত শীতের নদী ?

এখন আমি তো সূর্যের প্রত্যাশী
নই আর বৃথা আশার সাধনা জেনে,
স্থির পিলসুজে মাটির প্রদীপ জ্বেলে
সে কি কাছে ডাকবে না ?

যদি না-ই ডাকে, তবুও কি তার চোখ
হাসবে না ম্লান করে দিয়ে পোখরাজে,
স্মৃতিকুন্তলনিঃসৃত সৌরভে
পাবে না কি প্রাণ হাওয়া ?

যে-হাওয়ায় আমি ময়ূরপঙ্খি ঘুড়ি
ডাইনে ও বামে কুমারীর ছাদে ছাদে
রূপসী আলোয় বিকেলের যৌবনে
সাতরঙা সূর্যের।

অভাবিত কিছু ঘটবে না শুধু চাওয়া
পরিত্যক্ত রাতের পথের ঘুমে
ঘুরে ঘুরে দূরে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া
টাঙার জীর্ণ চাকা।

সে-কথা জেনেই, মেনে নিয়ে নৈঃশব্দ্য
ঘোর দুর্যোগে মাঝরাতে কড়া নাড়ি,

সে কি সাড়া দেবে, সে কি আছে উন্মনা ?
প্রাচীন শহরে অবাক অট্টালিকা
নিষ্প্রাণ খড়খড়ি ।

ছায়া

অঙ্গে চন্দন-গন্ধ নাই থাক
নাই বা থাক ফুলধনু
রেখেছি তমালের গোপন ডালে
যুবতী শ্রীরাধার তনু ।

তাই তো ভালবাসা এখন আছে
মুগ্ধ হয় চোখদুটি
হৃদয় ভোলেনি তো স্বভাব তার
রাতের বুকে চায় ছুটি ।

হাজার উন্মাদ শব্দ শুধু
প্রেম করে না মানুষেরা
শব্দ হয় শুধু শব্দ শুনি
শব্দে শুধু ঘোরাফেরা ।

যেখানে অস্থির শব্দ নেই
গোপন তমালের ডালে
নীরব রাত্রির ভালবাসায়
নয়নতারা দীপ জ্বালে

ঊষার মতো ক্রমে স্পষ্ট হয়
সেখানে শ্রীরাধার তনু ।
অঙ্গে চন্দন-গন্ধ নাই থাক
নাই বা থাক ফুলধনু ।

স্বপ্ন ভেঙে গেলে

স্বপ্ন ভেঙে গেলে কী থাকে আর
বৃথাই আগম আর নির্গমন
পরিশ্রম ঘাম ক্লান্তি ভার
স্বপ্ন ভেঙে গেলে কী থাকে আর
মাংসপেশীদের সঞ্চালন ।

প্রেমিক প্রেমিকার ব্যথা রাঙন
শিশুর হাসি ঘর আকাশ মেঘ
স্বপ্ন ছাড়া সবই অর্থহীন
দিনের পর রাত রাত্রিদিন
শ্রাবণমেঘ তাও নিরুদ্বেগ
সৌদামিনী যেন রুদ্ধবেগ।

আমাকে তবে কিছু স্বপ্ন দাও
মধুর মিথ্যার অসম্ভব।
যদিও লোকালয় স্বপ্নহীন
স্বপ্ন ছাড়া সবই অর্থহীন
আমাকে দাও কিছু স্বপ্ন দাও।

আরশি

পুরনো পাড়ায় টো-টো করে ঘুরি
যাকে চাই তাকে কাছে পেতে চাই।
যাকে চাই তার মুখের আদল
অনতিদূরের গ্যাসের আলোটা।

কাঁপছে, হাওয়ায় শিউরে উঠছে
দেখছে নিজেরই বিম্বিত মুখ
ক্ষয়ে যাওয়া ইটে যেখানে কান্না
জমে জমে সাত টুকরো আরশি।

ছাতা নেই, মনে বৃষ্টি ঝরছে
আমিই কি তবে গ্যাসের আলোটা!
নির্জন পথে থমকে দাঁড়াই
বিনিদ্র রাতে শব্দ ঝরছে।

বর্ষণশেষে খোলা জানালায়
সে কার দৃষ্টি ছিন্নভিন্ন
তারই আরশিতে বিম্বিত হব
তাকে চাই তাকে কাছে পেতে চাই।

যাও, উত্তরের হাওয়া

যাও, উত্তরের হাওয়া, তাকে গিয়ে বলে এসো, আছে
বসন্তের সম্ভাবনা পত্রহীন বিশুষ্ক শাখায় ;
যদিচ ফড়িং নেই, মৌমাছি বা, আনাচে-কানাচে
এখনও হরেক রঙ প্রজাপতি নিত্যই বেড়ায় ।
সে যেন ভাবে না গ্রীষ্ম একাধিক আসে না জীবনে ;
বালুকা-আচ্ছন্ন নদী, ধ্যানমগ্ন, মৃত কি তা ব'লে ?
পারে না রুখতে কেউ ভাবনার অঝোর শ্রাবণে
প্রবল আক্ষেপে যার পঙ্গুও পাহাড়ি পথে চলে ।
কী আছে যুবতী-দেহ সাড়া দিক কিম্বা না-ই দিক !
আমার অপরাজেয় অযোনিজ বীর সন্তানেরা
সমুদ্রে খাটায় তাঁবু, মরুবক্ষে বাঁধে স্নিগ্ধ ডেরা
সত্যকে সাজিয়ে করে সুন্দরের মতন অলীক ।
যাও, উত্তরের হাওয়া, তাকে গিয়ে বলে এসো, আছে
যৌবনের ধনুর্বাণ লুকানো ইচ্ছার শমীগাছে ।

যাব না

অবচেতনার বৃক্ষে অনেক পুষ্প
আমি ঘুরে মরি বাইরে ।
নিজেকে এড়াই পালিয়ে বেড়াই
কেন বিপরীত প্রান্তে
দক্ষিণ দিকে যখন শান্তি নেমেছে ?

কেন বা জুয়ায় বাঁধা রাখি সর্বস্ব
মদে খুঁজি অবলুপ্তি,
হাজার লোকের ভিড়ে খুঁজে পাই
কোন প্রশান্ত বন্দর ?

কিছু নয়, কিছু নেই, শুধু চাই
যন্ত্রণা এক তীব্র
আত্মঘাতের বেদনায় নীল
অমোঘ বিষের পাত্র ।
কেন চাই জানি না তা ।

নিজেকে এড়াই পালিয়ে বেড়াই
যেখানে আলোর রাজ্যে

শুধু চিৎকার গানের বিকার
ঘর্ম রক্ত মাংস।

অবচেতনার বৃক্ষে অনেক পুষ্প
কিন্তু আমি তো যাব না অন্ধকারে।
তুমি যে সেখানে অপেক্ষমাণ
মালতীলতার কুঞ্জে
যাব না, যাব না, যাব না অন্ধকারে।

ব্যর্থ

যৌবন তার একমুঠো ধুলো আকাশে
ব্রাউন রঙের রোদে বিকেলের ধর্মতলায়
ঘূর্ণি হাওয়ার প্রত্যাশী।

সম্ভাবনার মেঘ নেই, নেই প্রবাসে
অপেক্ষমাণ অবগুণ্ঠিন শকুন্তলায়
বিগত দশক উচ্ছ্বাসী।

জানে সে অতীত ভবিষ্যতের মতনই
বিচরণশীল নগরীর জুতো জামাকাপড়
চোখে আছে, নেই স্পর্শে।

বর্তমানেই জ্বালাযন্ত্রণা, এখনই
বেঁচে থাকা, মরা, বেঁচে মরে থাকা, শেষ কামড়
ডেঁয়ো পিঁপড়ের হর্ষে!

তাই সে আনবে ঘূর্ণি হাওয়াকে ফুঁ দিয়ে
আনবে এখানে, আনবে এখনই, ধর্মতলায়
নুড়ি পাথরের মুক্তিতে।

আঁকবে স্বপ্ন রঙের বাটিতে চুবিয়ে
বিপুল বেলুনে বাঁশের বাঁশিতে পথচলায়
হৃদয় অতল শুক্তিতে।

দৃঢ়প্রত্যয় একজোড়া চোখ দাঁড়াল
নাচবে আলোয় বিশশতকের ধর্মতলায়
দেখল রাত্রি অতীব চতুর পকেটমার।

অলিগলি

এই ক্লান্তি এই শূন্যতাই নাকি ঈশ্বরচেতনা
এই দুরারোগ্য অন্ধকারে রোমাবলি
এই যন্ত্রণার গর্তে ঘামে ভয়ে অনিশ্চয়তায়
এই অর্থহীনতার বোধে অলিগলি

এই জ্বর এই অস্থিরতা একি স্নায়ুদুর্বলতা
নাকি ঈশ্বরের প্রীতিস্পর্শ ভয়ঙ্কর
তাঁর প্রেম গোলাপের কাঁটা পঙ্কজের পাঁক নাকি
ব্যর্থতার ছাই ঝরা ফুল জীর্ণ ঘর

ম্লান কান্না অক্ষমতা আক্ষেপের আত্মনিপীড়ন
বোবা অন্ধ খঞ্জ ফাঁপা দিন মস্ত ঢেউ
রাত্রি রাত্রিদিন এই বোধ অস্তিত্বের ভার
নির্দয় প্রহার তীব্র জ্বালা ঘেউ ঘেউ

এ কি নৈকট্যনিবিড় তাঁর আলিঙ্গন নাকি ভ্রষ্ট
সমাজের ক্রূর অভিশাপ অর্থনীতি
কিংবা আমারই প্রাক্তন কর্মফল হস্তরেখা ভাগ্য
নাকি কিছু নয় মিথ্যা মায়া স্বপ্নস্মৃতি ?

আমি অবিশ্বাসী নিরীশ্বর শোকেতাপে অর্ধমৃত
পরাজিত হৃতশক্তি কিন্তু মূলাধার
অস্তিত্বই চেতনা যেহেতু আর এই বেঁচে থাকা
দেশে কালে পরিপার্শ্বে তাই রুদ্ধদ্বার

বিচ্ছিন্ন হয়েও যুক্ত তোমার শরীরে নগ্নতায়
এই দুরারোগ্য অন্ধকারে রোমাবলি
এই যন্ত্রণার গর্তে ঘামে ভয়ে অনিশ্চয়তায়
এই অর্থহীনতার বোধে অলিগলি ।

মৃত্যুর আগে

চোখে অনেক রাত নিয়ে যে ঘুরে বেড়ায়
গভীরতর রাতে আমায় নিয়ে যাবে
যেখানে ফুল
কথার হাসি
খুশির হাওয়া অন্ধকারে ।

ত্রস্তভীত কামপীড়িত মোমবাতির
পুতুল নিয়ে আঙুলগুলি ব্যস্ত যার
ও কিছু নয়
স্রোত সময় নদনদীর
ঝরাপাতার বাঁচামরার তুচ্ছতায়।

আমিও নেই তুমিও নেই, নেই প্রদীপ
সেখানে সেই অন্ধকার রত্নদ্বীপ
যেখানে কাল সাঁঝসকাল
জলের কাচে চায় কাছে

তাকেই যার শরীরময়
কথার ফুল
হিরণ্ময়

চোখে অনেক রাত নিয়ে যে ঘুরে বেড়ায়।

ম্যাডোনা

যখন সে কোলের ছেলেকে স্তন দেয়
(দেখিনি তা)
অনুমান করে নিতে পারি
বৃষ্টি ঝরে বৈশাখের তেপান্তর মাঠে ;
আবির্ভূত হয় ছায়াস্নিগ্ধ মায়ামুগ্ধ তরু, গ্রাম ;
জেগে ওঠে সূর্যালোকে শীতের কুয়াশা ঠেলে দিয়ে
স্রোতস্বিনী।

আমি তার কুমারী চোখের রহস্যের বিদ্যুতের
ছোঁয়াচ পেয়েছি একদিন।
সেই টানে
বহুদূর থেকে এসেছিলুম এখানে
কিছু সুর নিয়ে চোখে
কিছু ব্যথা নিয়ে প্রাণে
কিছু কথা নিয়ে অর্থহীন।
সর্বাঙ্গে পথের ধুলো, রৌদ্রের প্রহার, জ্বালা, তাপ,
রক্তের প্রলাপ, ক্লান্তি, অবসন্নতায় হতাশায়
শান্তি নেমে এল যেন ঘুমের আচ্ছন্ন অনুরাগে :
দেখলুম দুটি চোখ, ক্রীড়ারত শিশু আর
অসীম অনন্তকাল স্তব্ধ স্থির
মায়াবী আয়নায়।

বর্ষণ

রাত্রি আর নয় বিরহী যক্ষ,
ঊর্ধ্বগ্রীব, আহা, স্তনময়তায় ।
পেয়েছে প্রাণ আজ, জেগেছে ক্লীব যে
বৃষ্টিধারা অব্যর্থ লক্ষ্য ।

ছুঁয়েছে শব্দের স্নায়ুর কেন্দ্রে
অবাক যন্ত্রণা মলিন পুষ্প,
বিলীন জোছনার আভার ফাঁকে যে
অর্ধবিকশিত করুণ বন্দী ।

ছুঁয়েছে উন্মাদ উধাও মুক্তি
অবাক লাখ লাখ ক্ষুধিত বৃন্ত,
শুষ্ক শাখে শাখে ঝরছে বৃষ্টি
রাধার চোখে নামে কিশোর কৃষ্ণ ।

ঝরছে অবিরাম মুখর শব্দে,
অর্থ আর নয় সুদূরবোধ্য,
প্রস্ফুটিত ফুলে, বস্তুপুঞ্জে,
ঊর্ধ্বগ্রীব, আহা, স্তনময়তায় !

মধ্যরাত্রে

প্রেয়সী, তোমার যৌবন যেন বৈশাখী খরবায়ু
পুড়ে যাই আমি বৃক্ষ রিক্ত-পাতা ।
দু'বাহু বাড়াও, প্রাণ দাও নব জলধারাসিঞ্চনে
বিদূরিত হোক ভয়ের ধুলোর গ্লানি ।

প্রেয়সী, তোমার দুটি চোখ যেন মশালের আহ্বান
ছুটে যাই আমি পতঙ্গ ক্ষণজীবী ।
অবগুণ্ঠনে প্রদীপ জ্বালাও মৃন্ময় মমতার
বিদূরিত হোক মৃত্যুভয়ের গ্লানি ।

প্রেয়সী, তোমার এলোচুল যেন অর্বুদ হিজিবিজি
ব্যর্থ আমার চেতনার উদ্যম ।
ধীরে কাছে এসো, বাঁধো কুন্তল দিঘিসুশীতল স্নেহে
বিদূরিত হোক আত্মক্ষয়ের গ্লানি ।

প্রেয়সী, তোমার দুটি বাহু যেন সুদূরের দুটি পথ
মিলেছে আমার বহুদিনকার ঈপ্সিত প্রান্তরে ।
দু'বাহু বাড়াও প্রেমের করুণ মধুর আলিঙ্গনে
বিদূরিত হোক একাকিত্বের গ্লানি ।

বিরহ

সখী, দুঃখিত দক্ষিণ হাওয়া
চলে গেছে উত্তরে ।
শীত যদি আসে, আসুক আমার
নিঃস্ব এ অন্তরে ।
তুমি কাছে নেই, কিবা ব্যবধান
উদ্যানে প্রান্তরে !

কিন্তু কেমনে ম্লান সত্যটা ভুলি
সহৃদয় নয় সময়ের অঙ্গুলি,
অযতনে যদি ঝরে যায় দিনগুলি
ক্ষমা করবে না হিসেবের খতিয়ানে ।
ছুটবে কেবল রাত্রি পাগল
প্রভাতের সন্ধানে ।

সখী, ভাবনার বাতায়নে আর
উড়ে আসে নাকো পাখি
বনগন্ধের সৌরভে মাতোয়ারা,
হাসে না আকুল চামেলি বকুল
পারুল চপল-আঁখি
গৃহ-আঙিনায় কৌতুকে দিশাহারা ।
তুমি কাছে নেই, কেবা খোঁজ রাখে
কারা আসে, যায় কারা ।

সখী, আর নয়, ফিরে এসো তুমি
বৃথা বয়ে যায় বেলা,
সহৃদয় নয় সময়ের অঙ্গুলি ।
দ্যাখো যৌবন প্রৌঢ় এখন
শেষ হয়ে এল খেলা,
তোমাকেই দিই তোমারই এ-দিনগুলি !

ভোর

সমস্তরাত ভালবাসার ভোর হল,
বইছে বাতাস ঘুমমধুর ক্লান্তিতে ।
কোথায় তোমার আঙুলগুলি ? স্পন্দিত
বক্ষে আমার রাখো আবার, সঙ্গিনী ।

এখন তো আর ঝটিকা নেই, চোখ খোলো
দূরমাঠের নীলনীরব শান্তিতে ।
নখর-অধর না-ই বা থাক রঞ্জিত,
রিক্তদেহের দিঘিতে এসো, সঙ্গিনী ।

কলস-অলস চরণে এসো সাবধানে,
চঞ্চলতায় বাজে না যেন রিনিঝিনি ।
কাককোলাহল চিলের ক্ষুধা চিৎকারে
দূরের আকাশ নাতিদূরে তো খণ্ডিত ।

কেমন ও-রূপ কেবল দুটি চোখ জানে,
নাও এ-অধীর আয়নাখানি মূর্ছিত ।
আঁকড়ে তোমার এলোচুলের বন্যারে
রিক্তদেহের দিঘিতে এসো সঙ্গিনী ।

সমস্তরাত ভালবাসার ভোর হল !

অঙ্গে আমার

অঙ্গে আমার যৌবনভার
কত আমি আর বইতে পারি ।
নিজ তনু আধা গুণবতী রাধা
আপনি পুরুষ আপনি নারী ॥

স্বপ্নগমনে আত্মরমণে
তৃপ্তি সোনার পাথর-বাটি ।
জ্বলে দীপাবলি নগরে নগরে
আমি যে তিমিরে সাঁতার কাটি ॥

কোনখানে যাও বারেক দাঁড়াও
কিছু কথা আছে যন্ত্রণার ।

কনককাটারি কামে নাহি এল
উপরের ঝলমলানি সার ॥

হিয়া দগদগি পরান পোড়ানি
কত মধু-রাতি বিষের জ্বালা।
লহ সখী লহ হয়েছে অসহ
এ-বেশভূষণ কুসুমমালা ॥

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
প্রাচীন কবির ভীরু কবিতা।
গোরোচনা গোরি নবীনা কিশোরী
আসে নাই ঘাটে অতর্কিতা ॥

আসে নাই ঘাটে মুহূর্ত কাটে
যুগ যুগান্ত আমন্থিয়া।
পথে হল দেরি ঝরে গেল চেরি
দিন বৃথা গেল বৃথাই প্রিয়া ॥

কেবা সে স্বপনে ঘুমের গোপনে
বুনে গেছে সোনা ধানের সারি।
অঙ্গে আমার যৌবনভার
কত আমি আর বইতে পারি ॥

রিখিয়ায়

বইতে পারি না আমি এই গুরুভার
এত প্রেম কেন দিলে এতটুকু প্রাণে।
প্রেম জাগে দু'নয়নে, প্রেম জাগে ঘ্রাণে
প্রেম জাগে তৃষাতুর হৃদয়ে আমার।

ও হাওয়া, পাগল হাওয়া, কল্পনা উধাও,
উজ্জ্বল রৌদ্রের সঙ্গে হেমন্তদুপুরে,
কার স্বপ্ন বীজধান্য দু'হাতে ছড়াও
আকাঙ্ক্ষা-আচ্ছন্ন ঘুমে দূর থেকে দূরে !

সোনালি ধুলোয় ওড়ে তার লাল চুল
চুলের কস্তুরী গন্ধ তার কথা বলে
তার কথা লতাপাতা ছায়াবীথিতলে
মায়াবী মহুয়াবনে মাটির পুতুল।

মাটির পুতুল, প্রেম, ক্ষণিক সময়
আমার সামান্য আশা, পরিমিত দিন।
এই আলো, ঝলোমলো আহ্লাদী নবীন
অসহ্য অপরিসীম দৈবী অপচয়।

আনন্দ আনন্দ ঝরে আমার কৃপণ
হৃদয়ে, আনন্দ ঝরে, মধু ঝরে চোখে
স্নান করি রূপরসগন্ধের আলোকে
দূর আর দূর নয়—আত্মীয়, স্বজন ॥

কথা

নির্জনে বেদনাস্থির স্তব্ধতার আলো-অন্ধকারে
কথাগুলো নিয়ে আমি ছুঁড়ে দিই নিস্তরঙ্গ জলে।
যদি ক্ষীণ ধ্বনি ওঠে আবর্তের মূর্ছিত সেতারে,
কথার গুরুত্বে কিম্বা নিক্ষেপের নিপুণ কৌশলে
নয় তা ; আয়ুধবিদ্যা অনায়ত্ত এখনও আমাব।

আপন স্বভাবে জল সামান্য আঘাতে কেঁপে ওঠে ;
নতুবা আমার কথা সুর নয়, শব্দেব উদ্গার
বাক্‌বিড়ম্বিত মূকবধিরের আন্তর আস্ফোটে।

যেহেতু তোমার মনে আছে এক নীল সরোবর
সেই জৈব দুর্বলতা দুঃসাহসী করেছে আমায়।
না হয় আমার ডাকে করবে না সদর-অন্দর,
তবু তো কৌতুকভরে কান দেবে আমারই কথায়
যে স্বভাবে জল কাঁপে সামান্য আঘাতে, সেই রীতে

যদি এ-ধারণা ভ্রান্ত হয়, সেই ভ্রান্তির বদলে
চাই না সত্যের সুখ, বাসস্থান নিষ্কর জমিতে।
বরঞ্চ খাজনা দিতে রাজি আছি, নিজের দখলে
পাই যদি স্বপ্নলব্ধ কথা প্রকাশের অধিকার,
দু'দণ্ড তোমার সঙ্গ না মাড়িয়ে তোমার দুয়ার।

তোমাকে

বৃষ্টিভেজা শ্রাবণ রাতে ভাবনারা
পাড়াগাঁয়ের সন্ধ্যাদূরের পথ যেন

জটাজটিল লতায়পাতায় ফুরোয় না,
যদিও সেই মাঠ আর দিঘি ডাইনে বাঁ।

বিস্মরণে দীর্ঘ বছর বেঁচে আছি
প্রত্যহের ঠেলায় ঠেলায় পথ চলা।
তবুও আছে শীতল দিঘির প্রচ্ছায়া
চেনামুখের মৌনতরুর ভালবাসা।

তুমি সে মুখ, তুমিই সে মুখ, তুমিই তো
তুমি আমার শ্রাবণ রাত্রি দুরন্ত।
তোমার চাওয়া আমার পাওয়ায় ফুরোয় না
যদিও সেই মাঠ আর দিঘি ডাইনে বাঁ।

ঘরে-বাইরে

যেন তার চোখ দুটি আঁস্তাকুড় দেখেছে সম্মুখে,
নাসিকা পেয়েছে পচা নর্দমার দুর্গন্ধের ঘ্রাণ,
ঘৃণায় বেঁকেছে ঠোঁট, অবিশ্রাম থুথু ঝরে মুখে,
গঙ্গাজলে স্নান করে তবে বুঝি পাবে পরিত্রাণ।
কিন্তু সে গেল না ঘাটে। শীর্ণ ঘাড়ে বিবর্ণ ছাতাটা
তুলে নিল। তারপর জনাকীর্ণ রাস্তায় যখন
এল, তার কাছ থেকে গ্রাম্যজন ডাক্তারখানাটা
কোনদিকে জানতে পারে, এমি তার প্রশান্ত বদন।

চকিতে চলন্ত বাসে উঠে সে দেখল গোলগাল
ভরন্ত যৌবন নিয়ে মোলায়েম যুবতী ক'জন।
শিউরে উঠল ভয়ে : ঘরে তার জীবন্ত কঙ্কাল,
একটা ঝুলন্ত চামড়া, অভিধানে যাকে বলে স্তন।
বলল সেই ছাতাটিকে : হবে না, হবে না সব ঢিঢ্‌!
কুটিকুটি করে দিল দাঁত দিয়ে বাসের টিকিট।

মৃত্যু

শিকনি গয়েরে ভর্তি নর্দমার পাশে
শুয়ে আছে অন্ধ বৃদ্ধ
পুঁজগন্ধ জীর্ণ জরদ্গব :
সারাক্ষণ সেবা করে সুন্দরী নাতনিটি।
নগরীর মলমূত্র নর্দমার জল

গঙ্গাজলে স্পৃষ্ট হলে আচমনীয় হয়
শুচিবাইগ্রস্ত বিধবারও ।
পাড়ার ছোকরা যত বৃদ্ধটিকে কৃপা করে খুব
শিকনি গয়েরে ভর্তি পিকদানিটাকেও
মনে হয় যথেষ্ট সম্ভ্রম করে ।

কিন্তু তোমাকে মৃত্যু ঘৃণা করি আমি,
অন্ধকার, তোমাকেও পছন্দ করি না ;
যদিও অনেক তাজা জীবনের আলো
স্বপ্ন, সাধ, বীজ, সম্ভাবনা
তোমাদের ঘিরে থাকে ।

কেন

চকচকে টিনের ভাঙা নড়বড়ে তলোয়ারটাকে
অভ্যস্ত কায়দায় দুটো সরু সরু ঠ্যাঙের মধ্যে চেপে রেখে
সবার অলক্ষ্যে আমি মঞ্চ থেকে চুপি চুপি
নিষ্ক্রান্ত হয়েছি যথারীতি ।

বাইরে ভীষণ যুদ্ধ, থেকে থেকে রকমারি পটকার আওয়াজ
আড়ম্বর আক্রমণ হুহুঙ্কার ক্ষণিক স্তব্ধতা
সখীদের নাচ গান সুদীর্ঘ বক্তৃতা তর্ক বিতর্ক বিদ্রূপ করতালি
আবার আবার সেই কামান-গর্জন ।

যুদ্ধ হয়, যুদ্ধ থামে, ঘোরতর যুদ্ধ হয় ফের
পুনরাবৃত্তিতে কাটে দর্শকের উৎকণ্ঠিত সহস্র রজনী ।

জ্ঞান হওয়া ইস্তক আমি ভাড়াটে সৈনিক
নিতান্ত পেটের দায়ে কোনোক্রমে রণক্ষেত্রে উঁকি দিয়ে এসে
রাঙতার পোশাক মেকি গোঁফদাড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে
তাড়াতাড়ি ছুটে আসি
সাজঘরের আয়নায় দেখি নিজের সুপরিচিত মুখখানি
দেখে স্বস্তি পাই, পুলকিত হই ।

কিন্তু এক প্রশ্ন ফণা তোলে :
যদিও আয়নায় দেখি, রোজই দেখি, সহস্র আমাকে
তবু কেন যুদ্ধ ? কেন স্কন্ধকাটা হতে হয় ফের ?

শুধু প্রেম নয়

শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে,
যেমন অনেক বৃক্ষ কোমলাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ঢাকে ।
আছে লালসার দাঁত, লোভের বিকট জিহ্বা,
প্রভুত্বের লোমশ লাঙুল
ব্যঙ্গের কুঠার, ঈর্ষা, অন্যায়ের সহসা ছোবল
সইবে কেমনে ?
শুধু প্রেম নয় তাই যুগপৎ ঘৃণা রেখো মনে ।

ক্ষমা মহাত্মার সজ্জা । তুমি আমি সাধারণ লোক
ছোট কি মাঝারি গাছ, আমাদের দরিদ্র শরীরে
বর্ম কি বল্কল নেই কিংবা জ্যোতির্ময় গয়নাগাঁটি ।
আমাদের ক্ষমা শুধু পিছু হটা, চোখ বুজে থাকা,
দুর্বলতারই অন্য নাম ।
চারিদিকে পশুদের নখ, দাঁত, তর্জনে-গর্জনে
ক্ষমা নয়, প্রেম নয় ; কাঁটা, বিষ, ঘৃণা রেখো মনে ।

সাজে না অবজ্ঞা ক্ষমা অস্তিত্বই বিপন্ন যেকালে
অস্তিত্বের চেয়ে বড় আত্মসম্মানের ডালপালা ।
স্বপ্নের পাখির নীড় ছিন্নভিন্ন । শ্রাবণেও অনাবৃষ্টি হেনে
যারা কুঁড়ি ছেঁড়ে, যারা ফুলকে দেয় না দীর্ঘ সাধনার ফল
ফলকে দেয় না মাটি জল হাওয়া স্রষ্টার আসন,
শিকড়কে স্থানচ্যুত করে, মুঠি ধরে টানে চারাদেরও

ঘৃণার বিষাক্ত রসে গাত্রদাহ হোক না তাদের
প্রতিবাদ করো নিষ্ঠীবনে ।
শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে ।

চলো যাই

কাঠের গুঁড়োর গন্ধ বাতাসে, শহরে
অসংখ্য করাত রাতদিন
অরণ্যের আত্মাকে কাটে ।
চলো যাই
গঙ্গাতীরে আজও কিছু প্রাণ, কিছু প্রাচীনতা আছে
এবং অসুখী গ্রামে উজ্জ্বল সকালে
হলুদ ঢেঁড়স ফুল লাল তার হৃৎপিণ্ড নিয়ে
সূর্যমুখী ।

চোখ আছে, দৃশ্যবস্তু আছে
কিন্তু যেন আলোর অভাবে
সবকিছু তালগোল-পাকানো হাতড়ানো
কিংবা গুঁড়োগুঁড়ো
উড়োজাহাজের ট্রামের বাসের খাদ্য ।
খাইদাই ভালই, শুই ফিটফাট বিছানায়
খাঁজে খাঁজে মেদ কিংবা
ভাঁজে ভাঁজে দারিদ্র্য অথচ
ভদ্রতায় আত্মতৃপ্ত, কিছু লোনা উত্তেজনা কিনে আপাতত
খাইদাই ভালই, শুই ফিটফাট বিছানায়
প্রাতঃকালে মুখ ধুই ধবল গামলায়
এবং যদিও চামড়া ঢেকে রাখি শৌখিন পোশাকে
মাছ ঢাকা অসম্ভব শাকে ।
কাঠের গুঁড়োর গন্ধ, কাঠের গুঁড়োর গন্ধ,
কাঠের গুঁড়োর গন্ধ বাতাসে, শহরে ।
কিন্তু গ্রাম নয়
গ্রাম অসম্ভব, শব, স্মৃতির গোগ্রাস ।
আকাশে ও ঘাসে স্নিগ্ধ হৃদয়ের মুগ্ধ গঙ্গাতীরে
উদ্যান-নগরী চাই । চলো যাই সেখানে, যেখানে
প্রত্যেকের শখের বাগানে গানে প্রেমে বেদনায়
হলুদ ঢেঁড়স ফুল লাল তার হৃৎপিণ্ড নিয়ে
সূর্যমুখী ।

উপর থেকে নীচে

দেখছি কী আপ্রাণ চেষ্টা ! যতটুকু উঠছে, নামছে
দ্বিগুণ, তবুও উঠছে, নামছে ফের, উঠছে আবার—
যদিও সূর্যটা কষে ইজের পরেছে টানটান,
ঝরছে গলদঘর্ম পাঁজরার খাঁজে ও গর্দানে
এবং বুকের মাংস যেন ভ্রষ্ট বালিকা ঠুকরেছে ।

সর্বাঙ্গে বিষাক্ত কাঁটা রুক্ষ ঋজু নির্মম গাছটার ।
কিন্তু সে উঠবেই উঠবে । যতটুকু উঠছে, নামছে
দ্বিগুণ, তবুও উঠছে, নামছে ফের, উঠছে আবার ।
গরগর করছে রাগে, ফুঁসছে যেন পদাহত সাপ
কখনো চিৎকার ছাড়ছে যন্ত্রণায় কুঁকড়িয়ে ককিয়ে ।

ভাবছি মগডালে বসে এখানে সে পৌঁছবে যখন
কী পাবে ? একমাথা শাদা চুল ছাড়া আর কী শিরোপা ?

পরিস্থিতি

যেমনি ভো কাট্টা হয়ে উপড়ে গেল পেটকাট্টি ঘুড়িটা
মরল কার্নিক ছটকে ময়ূরপঙ্খিও,
গোঁত মেরে নিজেরই মাথা ভেঙে ফেলল একবগ্‌গা মুখপোড়া
ভয়ে ভয়ে গুটিয়ে নিল শতরঞ্জি নিজেকে হঠাৎ।
বেগুনি সবুজ শাদা একে একে অন্তর্হিত হলে
নোংরা আকাশটায় একমেবাদ্বিতীয় হলুদ
লেজঅলা লালমুখো এক অহংকারে উরু দেখিয়ে
নাচতে থাকল।

নেপথ্যে অনেকে খুব মাঞ্জা দিচ্ছে,
থমথমে আবহাওয়া।
আমরা আকাশভরা বহুবর্ণ প্রাণ ভালোবাসি।

হিতকথা

পালিয়ে আয়। কামড়ে দেবে। দাঁতমুখ-খিঁচোনো দলভারী
খেঁকি কবন্ধেরা বড় সাংঘাতিক, বিষাক্ত, একজোট।
শান্তিতে দেবে না থাকতে, পা মাড়িয়ে কোঁদল বাধাবে,
ভেংচি কাটবে, দুয়ো দেবে, তুলবে তোর স্বর্গত মা-বাপ।
চাই কি ছুড়বে ঢিল, টেলিফোনে বেড়াল ডাকবে,
লটকাবে পোস্টার লাল, বলবে তোকে মাতাল, লম্পট।
মানুষের মতো দেখতে, খেঁকি ওরা, অসম্ভব চিজ।
লেজ ধরে টানবে অন্যে, সামনে পেয়ে তোকেই কামড়াবে ;
রাস্তায় জমাবে ভিড়, তিন মাইল মিছিলে চেঁচিয়ে
পোড়াবে খড়ের মূর্তি অবিকল তোর মতো মুখ।

মস্তিষ্ক অবশ্য নেই, আছে শুষ্ক প্রচণ্ড আক্ষেপ,
ভাঁটার জঞ্জাল নোংরা, অক্ষমের বিকৃত আক্রোশ
বিষোদ্গারে শান্তি চায়, উপলক্ষ যা কিছুই হোক।
যদি না ঝাঁপ দিবি জলে পালিয়ে আয় ডাঙায় এখুনি।

ভোজ

সে নিজেই টলছে বলে আলমারিটা নড়ছে, খাটটা
বেদম দুলছে, ছাদ ভেঙে পড়ল মাথায়, এই রে
সামনে হাঁ-করা ঢেউ, পিছনে কী ঘোর অন্ধকার,

দাউদাউ আগুন, পাঁক, পূতিগন্ধ, বমন, শমন,
তালগোল পাকানো সাপ, বাঘ, সিংহ, কুমির ইত্যাদি।

যেই সে টলবে না বলে মনঃস্থির করেছে, হঠাৎ
এক ঝাঁক মাস্টার এসে ঘিরে ধরল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে।
তাদের নিষ্ঠুর হাতে মোটা ভোঁতা একগাদা পেন্সিল।
বলল, লিখতে হবে একশো পাতা এই দাগ ঘেঁষে।

যক্ষুনি সে লিখে ফেলল গোটা গোটা লাইন মাফিক
হাততালি পড়ল জোর, টাকা এল নয়াদিল্লি থেকে।
তারপরে সবাই মিলে তাকে নিয়ে কাটলেট বানাল।

গুরু-শিষ্য

ধ্যানাবিষ্ট চোখ। যদি পেটে তার পেন্সিল গুঁজে দি'
ঢেঁকুর তুলবে বটে এলোমেলো নানা উদ্ধৃতির।
বিস্তর টকগন্ধ, কিছু ধোঁয়া ছেড়ে, কেশে,
কী এক কিম্ভূত বস্তু কাগজের ওপর শোয়াবে!

ভিরমি রোগে ভোগে যারা, তাদের তো হবে চক্ষুস্থির
বলবে, আহা, সৃষ্টি বটে! বাহা, বাহা পণ্ডিত বনেদি,
আসুন, ঝাড়া দু'ঘন্টা বক্তৃতায়, ঘুরুন স্বদেশে।
আমরা শুনব না, কিন্তু মুগ্ধ হব আপনার ভাষণে।
যেহেতু ঝিমুনি এলে মাঝে মাঝে দেবেন সুড়সুড়ি
নরম জায়গায়, মানে, আমাদের খানদানি অহমে;
মেলাই নজির টেনে বিশেষণ দেবেন একঝুড়ি
উপস্থিত শ্রোতাদের প্রত্যেকের বাপঠাকুর্দাকে।
যে-সব চ্যাংড়া ছোঁড়া ঢিল ছুড়বে মৌমাছির ঝাঁকে
বলাই বাহুল্য, তারা ভিনদেশি, বাক্যে-আচরণে,
নিশ্চয় বেঘোরে তারা পৈতৃক প্রাণটাই খোয়াবে!
আমরা সর্বদা থাকব নিরাপদ ভিড়ের গরমে।

পেলুম না

পেলুম না এই দুঃখে স্বপ্নময় হয়ে ওঠে ঘুম
কিছু নয়
হাস্নুহানা-ছোঁয়া দোরগোড়ায় মানা রেলিঙ আবছায়া

শীতের খুব রাত্তিরে ঘুরি একা-একা, পুব
বাতাসে কী কশা ভাসে ঝাউয়ের সরোদে
পেলুম না পেলুম না পেলুম না।

পেয়েছি যা কিছু সবই প্রাপ্তির মুহূর্তে বিস্বাদ
ভয় গ্লানি হানি নাম পরিণাম বিরক্তি জঞ্জাল
করুণ শিউলি ফুল দিনগুলি ধুলোপায়ে মাড়িয়ে এসেছি
যা পেয়েছি সেও দুঃখ
রোদ ঘাম বর্তমান চতুর চকিতে
অতীতে হারিয়ে যায়
যায় যায় আগামীর এইমাত্র থেকে।

যা পেয়েছি সেও দুঃখ অপরোক্ষ আবক্ষ মর্মর
বাতাসে কী কশা ভাসে ঝাউয়ের সরোদে
পেলুম না পেলুম না পেলুম না।

সাবেক

সবাই ইয়ারবন্ধু মনে হয় চৈত্রের সন্ধ্যায়!
প্রবাসীরা ফিরে আসে উনিশ-শতকী টেরি কেটে।
হেই, হাসিখুশি চাঁদ, প্রাণ যেন হাঁফ ছেড়ে বলে,
দু'দণ্ড একজোট হয়ে ছিমছাম ধোঁয়া ছাড়ি এসো:
যাক ঝাপসা হয়ে যতো ফুটোফাটা ছেঁড়া আবর্জনা।
এসো গো অপ্সরী হাওয়া, নাচো, গাও, স্ফূর্তির ফোয়ারা
ছোটাও গড়ের মাঠে প্রগল্‌ভ ঘাসের পাতায়,
মঞ্জীরধ্বনিতে স্বপ্ন আঁকো পানসি নয়নপল্লবে।
তুমি বা লাজুক কেন? ডেকে ওঠো গজলে ঠুংরিতে
কুহুকুহু কুহুকুহু চিতচোরা, হে বসন্তসখা।

সবাই ইয়ারবন্ধু মনে হয় চৈত্রের সন্ধ্যায়।
তবু, ওহে নটবর, ফিরে চলো নিজ নিকেতনে।
চত্বরে ভেঙো না হাঁড়ি, ঠারে ঠোরে পিপাসা মেটাও।
যদি না জ্বলজ্বল করো, লোক হাসাতে সভায় যেয়ো না।

একটি কবিতা

সব কবিতাই পুনর্লিখিত কবিতা;
সেই ঘাস, সেই আকাশ, মানুষ, নারী।

ভোরবেলাকার মাখন-রঙের রোদে
প্রতিদিন তুমি নবনবরূপে এসো ।

কাছে আছে যারা, পিছনে, দূরান্তরে
সকলেই মহাসমুদ্রপথযাত্রী ;
সময়-স্রোতের আলোকে-অন্ধকারে
কেউ অদৃশ্য, কেউ বা প্রতীয়মান ।

কিন্তু সবাই আছে, সব কিছু আছে
যারা ছিল আগে, আসবে আগামী দিনে
সব কিছু আছে ভোরবেলাকার রোদে
একটি কবিতা আবার জন্ম নিলে ।

একটি কবিতা আবার লিখিত হয়
পুরনো শব্দ, কথার রূপান্তরে
ঈষৎ আলোক, ঈষৎ অন্ধকারে
প্রতিদিন তুমি নবনবরূপে এসো ।

যখন ক্লান্ত হবে

যখন ক্লান্ত হবে ইচ্ছাগুলি
হতাশ মোমের বাতি জ্বলবে ঘরে
প্রখর মনস্তাপে পুড়বে জ্বরে,
দেয়ালে আঁকবে রূপ মায়াবী তুলি ।

গভীর বনের মাঝে প্রস্ফুটিত
একটি ফুলের মুখ আনন্দিত
ছড়াবে গন্ধ তার হৃদয় জুড়ে
যখন মোমের বাতি মরবে পুড়ে ।

সুখের বিকেলে তুমি পাবে না তাকে
অথবা সকালে কোনো রৌদ্রস্নাত,
সে-ফুল থাকবে একা অনাঘ্রাত
সুদূর ঊর্ধ্বমূল অবাক শাখে ।

অনেক নিবিড় রাতে যখন মনে
স্মৃতির শিল্পী তাঁতে কাপড় বোনে,
সহসা একটি ছবি ছায়ার মতো
এসেই মিলিয়ে যায় বিস্মরণে

এবং হৃদয়ে রেখে দারুণ ক্ষত।
প্রখর জ্বালায় যার মনস্তাপে
হতাশ মোমের বাতি হুতাশে কাঁপে
তখনই সে-ফুল হয় রক্তগত।

ভোর-গরবি

তিনটি ফুল যেন তিনটি বোন
বেগনি শাড়ি পরা, বারান্দায়
সোনালি রোদ্দুরে সকালে সুহাসিনী।

চকিতে জেগে ওঠা শিকারি যৌবন
রঙের তীর ছোড়ে কালোব পর্দায় ;
ছিল না কোনোদিন বালিকা-বয়সিনী।

আকাশে আধো আলো, এখনও ঘুমঘোর
তিনটি বোন তবু সেরেছে প্রসাধন।
শিশিরস্নাত দেহে কিসের প্রত্যাশা !

এখনই টেনে নেবে খুশিতে ফাঁসিডোর
পুরুষ সূর্যের মৃত্যুচুম্বন।
আত্মঘাতী বুঝি প্রাকৃত ভালবাসা ?

নাগর

যার আসে, সহজেই আসে। আমার কেবল
কান পেতে অপেক্ষায় থাকা। যদি আসে
খিলখিল হাসিতে, রঙ্গে। নাচি তাই। কিংবা যন্ত্রণার
গোঙানিতে। মাথা ঠুকি। যদি আসে স্মৃতির বন্যায়
এলোচুল অন্ধকারে। ভাবি। যদি আমারই দেহের
কবোষ্ণউত্তাপে আসে ম্লান জ্যোৎস্নায় নিশি-পাওয়া
উৎসুক বিহঙ্গ অঙ্গ। পেতে রাখি বাসশয্যা। আমার কেবল
অপেক্ষা, অপেক্ষা শুধু, অপেক্ষায় থাকা। যদি আসে।

আসে না। গাছের ছায়া দেয়ালে ক্রমশ
গাঢ়তম হয়, কাঁপে। তারাগুলি স্পষ্ট, স্পষ্টতর।
দরজা জানলা খুলে তবু অপেক্ষায় থাকি যদি আসে।

আসে না হরবোলা ধ্বনি, বহুরূপী শব্দের মিছিল।
আমার ব্যাকুল দৃষ্টি দূর থেকে দূরে হেঁটে যায়।
দ্যাখে সবই মৌন, মূক, স্তব্ধ, নির্বিকার। সে আসে না।

শেষ খুঁটিগুলো

শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত করে ধরে রাখতে চাই।
একে একে বাড়ি ঘর ভেসে গেল প্রবল জোয়ারে
ভাই গেল বন্ধু গেল পুত্র কন্যা পরিবার তাও
ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে বাঁক নিল দূরবর্তী স্রোতে
শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত করে ধরে রাখতে চাই।

শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত করে ধরে বেখে দিয়ে
এ-বিশ্বাস নিয়ে যেন মৃত্যু হয় আমার, ঈশ্বর :
এইখানে একদিন মানুষেরা ঘর বেঁধেছিল
পুত্র কন্যা পরিবার ভাই বোন বন্ধু পরিজন নিয়ে
এইখানে একদিন মানুষেরা ঘর তুলবে এসে।
নতুন খড়কুটো নিয়ে পরস্পরকে ভালবেসে।

শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত করে ধরে রাখতে চাই॥

গার্ডেন-রিচ জেটি

কপিকলে নেমে আসছে বড়ো বড়ো আঁটসাট পেটি
কী বিশাল পণ্যবাহী জাহাজের পেট।
নামাল দৈত্যের দেহ কিমাকার ভারী যন্ত্রপাতি,
কয়েক শো গমের বস্তা, কাগজের গোলা একরাশ।
আর নেই? আরও আছে। উঁকি দিচ্ছে ইস্পাতের গা

কেমন সহজে সব হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রে ও মানুষে
একাকার গলাগলি, যেমনটি কৃষক-লাঙল।
স্বপ্নসমাহিত দাঁড়িয়ে এস্ এস্ ইভনিং স্টার
মাখছে সিঁদুর রঙ নিরাসক্ত নাবিকের হাতে।
ওদিকে নৌকোর মধ্যে উনুনেতে ভাত ফুটছে কার।

জলের নিকটে এলে মানুষ কি বোবা হয়ে যায়!
ভাবে, সেও গাছ মাটি মেঘের ছায়ার মতো কিছু।
শীতের দুপুর হাওয়া ধুলো রোদ সব কিছু জড়িয়ে
ছড়িয়ে রয়েছে তার অস্তিত্বের নিবিড় শিকড়।

চতুর্দিক শান্ত তাই, স্বাভাবিক। উঠছে নামছে
বস্তুভার ধাতুপুঞ্জ, মানুষেরই একাত্ম শরীর।
নাম ধরে ডাকলে কেউ চমকে উঠে ভাবলুম, আমি কি
জাহাজ, নাবিক কিম্বা সোনালি ডানার গাঙ্চিল।

সদর দরজা

সে তার ভাবনাগুলো নিয়ে একটা বাড়ি বানাচ্ছিল;
কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছিল না সদর দরজাটা।
ভিতরের ঘরগুলো মোটামুটি দাঁড়িয়েছে একরকম
কিন্তু বাদ সাধছে খালি বেয়াদব সদর দরজাটা।

সদর দরজাটা কিছু মামুলি হলে তো চলবে না!
এখান দিয়েই ঢুকবে যাদের সে চমকে দিতে চায়
কড়া ইস্তিরির ভাঁজে, বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল পালিশে।
সদর দরজাটা তাই কায়দামাফিক হওয়া চাই।

বহু ভেবেচিন্তে দুটো ছ'ফুট সাত ইঞ্চি দৈত্যকে
খোদাই করল দুই কপাটের ভারিক্কি গতরে।
হাতে গদা (অবশ্য সোনার) চোখে অগ্নি (দামী পাথরের)
দৈত্য দুটো হাঁকেডাকে খানদানি বলেই মনে হল।

পরম সন্তুষ্ট চিত্তে যেই না সে ঘরে ঢুকতে গেল,
দৈত্য দুটো গদা ঘুরিয়ে হাঁক ছাড়ল, তুম কৌন হ্যায়!
খিড়কির জানলাটা দিয়ে পাখি এসে ঠোঁটে করে তাকে
ভাগ্যিস পাচার করল নিরাপদ বকুলতলায়।

প্রস্তুতি

পরিপাটি চুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে
নিটোল তর্জনী কামড়ে লোনা রক্ত খাই
আরশিতে যে-লোকটা হাসছে তাকে আমি মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে
দরজা খুলে দুড়দাড় নীচে আরও নীচে চলে যাই।

অপেক্ষা করছে না কেউ। উত্তরের হাওয়া
ধুলোয় বিভ্রান্ত করে দুমড়ে দেয় পা।
এই কি যন্ত্রণা সেই সব হারিয়ে যথাসর্ব পাওয়া
যা নাকি একদিন শিউরে দিয়েছিল গা।

না তো। আরও নীচে তবে। নরকে পাতালে
নীরন্ধ্র অসূর্যলোকে পাথরের ফুল
প্রেমের মতন তীব্র, মৃত্যুর কঠিন ঘুম চোখে
কে নারী ঝঞ্ঝার সমতুল।

কবিতা, তরঙ্গভঙ্গ, অসুস্থ আবেগ
আমাকে যন্ত্রণা দাও, মাটি খোঁড়ো লোহার আঁচড়ে।
উপরে সাজানো ঘর, জানলায় রক্তহীন মেঘ
আমাকে গভীরে টানো, মারো, ঢাকো ধূসর চাদরে।

এখন প্রস্তুত আমি। ভেঙেছি লোহার তালা, ইটের দেয়াল
নির্জন প্রান্তরে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। হাত
তুলেছি ঊর্ধ্বলোকে নিম্নাঙ্গে ঢেউয়ের করতাল।
এই তো সময়, হানো তীব্রতম তোমার আঘাত।

ভাঙা-গড়া

ছিঁড়ে ফেলো। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে ওড়াও
যা কিছু সামান্য, তুচ্ছ, নিত্য-ব্যবহৃত, গৃহস্থালি।
পুরনো চিঠির গুচ্ছ, হলদে খাম, পঠিত বইয়ের মধ্যে
নিষ্পেষিত ফুলের একদা। এবং বর্তমানও।
এই যে দুপুর, এক নেশাগ্রস্ত বুড়ো, এর ঘাড় ভাঙো।
দূর করো হাঁপানো বিকেল।
ছিনাল সন্ধ্যাটাকে দুমড়ে দাও চিৎকারে চিৎকারে।
স্বপ্নভুক রাত্রিটাকে আঘাতে আঘাতে খুন করো।
যা কিছু পুরনো, জীর্ণ, জঙ্ধরা কবজার,
যা কিছু আঁকড়ে থাকে, জড়ায়, ছড়ায়
ভাঙো, ছেঁড়ো।
তেমন শক্তি যদি না-ই থাকে
অন্তত তুবড়ে দাও। আর
তখনই শুনতে পাবে ভেসে আসা গান, জাদুমন্ত্র।
ফিরে আসবে পূর্ণ হয়ে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা,
রাত্রির শরীর
গড়নটা ভিন্ন, অন্য নাম, কিন্তু নির্মল নিটোল।

অন্ত্যেষ্টি

দু'হাতে ছিঁড়ছে চুল। বলছে, আর পারছি না, নেবাও
অশ্রাব্য আলোর ধূর্ত ক্রূর চোখ। বিষম বাজনা,
বিজোড় শব্দের রাশি স্তব্ধতার ধ্বনিতে ডোবাও।
আমি বড় অসহায়, নগ্ন, নিঃস্ব, অসুস্থ, অস্থির।

কিন্তু শুনছে না কেউ। তারস্বরে বাজছে দামামা,
নাকারা, জয়ঢাক, শিঙা মদমত্ত ঘোর স্বৈরাচারী।
চলছে উদ্দাম নৃত্য, অট্টহাসি, বিদ্রূপ, চিৎকার।
এবং মশাল জ্বলছে, অগ্নিকুণ্ডে লেলিহান শিখা।

তথাপি সে গান ধরল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সুর।
হা-হা করে হেসে উঠল নিশাচর অন্ত্যজ আক্রোশ।
চিত্রিত ফুলের পাপড়ি মুহূর্তেই কৃষ্ণবর্ণ হয়ে
ঝরে পড়ল একরাশ গন্ধহীন কিম্ভূত হতাশ।

হ্যাঁ, সেও স্বাধীন, তাই ঝাঁপ দিল স্বেচ্ছায় আগুনে।
নরমাংসলুব্ধ শত জিহ্বাদের লালাস্রাব হল।
কেউ চোখ উপড়ে নিল, কেউ উরু, কেউ বাহুদ্বয়।
কেবল হৃদয় তার চুরি করে নিয়ে গেল পাখি।

যান্ত্রিক

যেন একটা পাখি ডাকল। চেনা গলা। চারদিকে তাকাই।
কই, না, কোথায় পাখি ? আশেপাশে গাছপালা নেই যে
লুকিয়ে থাকবে। সামনে বই। খোলা বইয়ে চড়াই উৎরাই
পাথর, কাঁকর, ধুলো, শুকনো ঘাস। তবে
কোথায় ডাকল পাখি ? কোথায় সে ? আমিই কি নিজে
পাখি হয়ে ডেকে উঠছি ? অসম্ভব। উৎসাহ কি যুক্তি নেই তার।
গুঞ্জিত মূর্খের স্বর্গে আশাবাদে কী হবে আমার
যখন নিয়েছি বেছে শরশয্যা যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় ?
নাকি এ সত্যিই ভুল ? জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা ? কবে
ছেড়েছি যে-নেশা তাঁর চোঁয়া উঠছে ? না, না, শোনো ওই
আবার ডাকছে পাখি, চেনা পাখি, কাছেই এবার।
কোথাও তো কেউ নেই এত রাত্রে একা আমি বই।
তা হলে কে ডাকে, কাকে ডাকে, কেন ডাকে, সে কোথায় ?

হাসলুম। ও পাখি নয়। পাখির চাইতে বেশি পাখি।
সর্বদাই ডাক ছাড়ে, গান গায় দিন কি রাত কি।
আপাতত দুঃসাহসী ; বস্তুত সে নকল সৈনিক
নেহাত অভ্যাসবশে বুলি ছাড়ছে তথাখ্যাত দায়িত্বের দায়,
বিশ্বাস প্রত্যয় আশা সব মিলিয়ে স্বদেশি, সঠিক।

একশো নম্বর পাবে পুরোপুরি এবং খোরাকি।
আমারই পকেটে বন্দি শূন্যগর্ভ প্ল্যাস্টিকের পাখি।

দুঃস্বপ্ন

ধা. করে মাথায় রাগ চড়ে বসলে, ছুড়লুম বইটাকে।
দেয়ালের পলস্তারা খসে গিয়ে নারীমূর্তি হল।
ক্ষীণ কটি, গুরু উরু, নিতম্বিনী কটাক্ষে আমায়
আহ্বান জানাল তার স্তনদ্বয়ে, পেলব উদরে।

সভয়ে দু'চোখ বুজে নারায়ণ নারায়ণ বলি !
মুহূর্তে সে মাতৃদেহ কী প্রকাণ্ড গর্ভবতী হয়ে
প্রসব করল এক শাদাচুল আয়তনয়ন
আচার্য, যেমন কিনা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে।

নারী নরকের দ্বার, বলল সে চোখে চোখ রেখে :
নারী নরকের দ্বার, বলল সে চটি ঘষে ঘষে ;
নারী নরকের দ্বার, বলল সে দাঁতে দাঁত চেপে।

নিঃসাড়ে প্রস্রাব করে জল খেলুম পাথর-বাটিতে।

অনিবার্য

এই সব লোহা নিংড়ে অবশ্যই সোনা পাওয়া যায়,
কেনা যায় রাঙা মুলো, গাজর কয়েক কেজি বেশি.
বুক চিতিয়ে চলা যায় উঁচিয়ে উলঙ্গ মাংসপেশী।
কিন্তু হরিভক্ত মন হাওয়া খেয়ে থাকতে ভালবাসে।

ভালবাসি একা একা মাইল মাইল পথ হেঁটে
নির্জন খালের ধারে বাবলা গাছতলার দুপুর।
এখানেও হানা দিলি ওরে নোংরা অসভ্য কুকুর !
আমার ছালচামড়া ছিঁড়ে বুঝি তুই ডুগডুগি বাজাবি ?

পালিয়ে যা, টিলিয়ে তোর ঠ্যাং খোঁড়া করব এক্ষুনি,
পালিয়ে যা প্রকাণ্ড ঘরে, আধো অন্ধকারে ঠাণ্ডায়
নরম কোলের মধ্যে মৃদুগন্ধে ডুবে যা বন্যায়,
ফুটে উঠবে চোখে তোর অনিবার্য স্বর্গীয় গোলাপ।

গোলাপ ! শিউরে উঠি। সুচিক্কণ ড্রইংরুমের
চাপা হাসি, মাপা দুঃখ, মেকি বুক, সুখের অরুচি
কবে তোর পাপড়িগুলো নখ দিয়ে করে কুচিকুচি
ছড়াব প্রেমিকজন যারা আজও ভালবাসি ঘাস।

শিল্পী-কথা

'শহর ক্ষুধার্ত মরু,' নন্দলাল বসু বললেন,
'অচিরে করবে গ্রাস গ্রামের গোপন গাছপালা,
জলাশয়, পশুপাখি। হৃদয়ের যত লেনদেন
গ্রাম্য মানুষের শিল্পে উৎসবে কি নাচে গানে ঢালা
রয়েছে কুটিরে মাঠে মেলায় পুতুলে পটে সব
স্তব্ধ হয়ে যাবে, শুধু লণ্ডন ন্যুইয়র্ক কলকাতা
স্ফীত, স্ফীততর হবে।' 'শিল্পী কি থাকবেন নীরব ?'
শুধালাম মৃদুস্বরে। শিল্পাচার্য বললেন, 'বিধাতা
চিরস্থায়ী রাখেননি কিছু। আক্ষেপ করে না কেউ
প্রাগৈতিহাসিক লুপ্ত প্রাণীদের শোকে। জাদুঘরে
একদিন স্থির হবে আমাদেরও উদ্যমের ঢেউ
আজকের শিল্পকর্ম। তখনও হয়ত সমাদরে
কয়েকটি ব্যগ্র চোখ খুঁজে নেবে উত্তরাধিকার।
সুতরাং বৃথা শোক। পট যদি যায়, যাক। প্রাণ
নিজেরই গরজে রঙতুলি নিয়ে বসবে আবার।
মেলায় যে নাচ জমে, নদীবক্ষে হয় যেই গান
এনো না তাদের টেনে কলকাতার শৌখিন বন্দরে।
যদিও পবিত্র অতি, স্থান তার তুলসীতলায়
মানায় না গোময়কে শঙ্খশুভ্র চাদরের পরে।'

'গ্রামীণ শিল্পের প্রতি তাহলে কি নেই কিছু দায় ?'
হতাশাজড়িত কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করলাম।
'পাবে না কি মৃতপ্রায় লোকশিল্পী প্রাণের সম্মান ?
পারি না উদ্ধার করতে শহরের গ্রাস থেকে গ্রাম ?'
'সম্ভবত পারো। কিন্তু থাকা চাই মাস্তুলের জ্ঞান,'
চশমার কাচ ঘষে নন্দলাল বসু বললেন।

'যে-জাহাজ যাবে বলে স্থিরলক্ষ্য লণ্ডনের দিক,
যাবেই সে ; হয় তুমি ঝাঁপ দাও সমুদ্রে সফেন,
নতুবা মাঝিকে ঠেলে হতে পারো বিদ্রোহী নাবিক ।
স্বয়ং গান্ধিজি যেটা পারেননি আপ্রাণ চেষ্টায়
আমরা সামান্য লোক কী করে তা করব সম্ভব ?
গ্রামগ্রামান্তর ক্রমে চূর্ণ হবে শাখাপ্রশাখায়
বর্ধমান শহরের পদক্ষেপে । যত কলরব
পাখির, দিঘির আর গাছের পাতার, ডুবে যাবে ।

'সেই দুর্দৈবের আগে,' শিল্পাচার্য বললেন, 'যাও
গ্রামে গ্রামে । ধুলোয় কাদায় এখনও অনেক কিছু পাবে
গান প্রাণ শিল্পের সম্ভার । মহানন্দে তুলে নাও,
ঐতিহ্যকে চিনে রাখো । কতটুকু গ্রহণ বর্জন
করবে তা ভাবো । দ্যাখো গুরুদেব কেমন সহজে
গ্রাম্যশিল্পকেও মেজে করেছেন একান্ত আপন ।
তাই মঞ্চহীন নাট্য তাঁর দ্বারা সম্ভব হল যে ।
যদি কিছু না-ই পারো সংগ্রহকে রেখে দাও কোনো
আগামী শিল্পীর অনুপ্রেরণার জন্যে জাদুঘরে ।

'আরেকটা কথা বলি অতিশয় মন দিয়ে শোনো :
শিল্পীর এবং শিল্পের মূল্য নয় জাতের কদরে ।
পটুয়া সংগীত গায় মুসলমান শিল্পী যেমন,
সুইডেনের সূচিকর্ম তদ্রূপ বাংলার কাঁথায়
আসে যদি, আসুক না ; আনন্দরসিক শিল্পী-মন
দেবে নেবে অকাতরে বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্যসভায় ।
সাঁওতালি বাদ্য শুনে শান্তিনিকেতনে খাঁ সাহেব
সযত্নে নিলেন তুলে যন্ত্রে তাঁর । অত্যাশ্চর্য রূপ
দিলেন নিজের কিছু যোগ করে দিয়ে । অতএব
বিদেশি বিধর্মী বলে শিল্পে যেন হয়ো না বিরূপ ।
রসের আনন্দভোজে সবে যেন নিমন্ত্রণ পায় ।
হোক না সে বয়োবৃদ্ধ উগ্র কি প্রাচীনপন্থী, তারও
রয়েছে সাধনা, প্রেম । আশ্রমের সাহিত্যমেলায়
ঘটেছে অনেক ত্রুটি, তার থেকে শিক্ষা নিতে পারো ।

'সম্প্রতি আশঙ্কা এই শিল্পকেও ব্যবসায়িজন
আঁকড়ে ধরেছে । যেন বাড়ির বউকে ধরে নিয়ে
সিনেমায় নটী করা । বারবনিতার প্রয়োজন
হয়ত বা আছে, কিন্তু নেশা যেন দেয় না ভুলিয়ে
মঙ্গলরূপিণী গৃহবধূটিকে, শিল্প যার নাম ।'

ক্রমেই প্রখর রৌদ্র। যদিও এখনও যৌবনের
উজ্জ্বলতা তাঁর চোখে, ভাল নয় হাল শরীরের।
বিদায় নিলাম তাই শিল্পাচার্যে জানিয়ে প্রণাম।

[শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কথা শোনবার দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল শিল্পীর বালিগঞ্জের বাসভবনে। কথাপ্রসঙ্গে শিল্পাচার্য যা যা বলেছিলেন হুবহু তার উপর নির্ভর করেই 'শিল্পী-কথা' লেখা হয়েছে। —লেখক]

হলদে প্রজাপতি

মনে পড়ে, সুরঞ্জন, কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে
মোমবাতি জ্বালা আধো অন্ধকারে আমরা দু'জনে
অখ্যাত কবির লেখা আধছেঁড়া একখানি বই
নগদ পাঁচ পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে প্রায় সারারাত
মুখস্থ করেছি বসে শিয়ালদায়, তোমার মেসের তক্তাপোশে ?

বইটার কী নাম ছিল ? সম্ভবত 'হলদে প্রজাপতি'।
কবির নামটা ঠিক মনে নেই। তবুও সে-বইয়ের অনেক
ধূসর কথার টুকরো মাঝে মাঝে আজও ভেসে আসে
ফাল্গুনের অন্ধকার, নারীর শরীর আর ভুনিপার বন।

কী অনুকম্পায়ী ছিল আমাদের প্রথম যৌবন !
বুদ্ধদেব বসু আর বিষ্ণু দে-র যাবতীয় লেখা
বারবার পড়ে তবু তৃপ্তি নেই কবিতা পড়ার,
জীবনানন্দ দাশে অতঃপর অভিভূত হয়েও তবুও
অজানা কবির লেখা স্টলে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করেছি।
'হলদে প্রজাপতি' সেই ক্ষুধার্ত দিনের আবিষ্কার।

মনে পড়ে, সুরঞ্জন, সেই সব প্রায়োন্মাদ দিন
আমাদের কথাবার্তা কবিতার উদ্ধৃতিতে ভরা ?
ঢাকার অশোক মিত্র ? স্বপ্নময় ভোরের শিশির ?
পুরুষের দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণার গোপন বৈভব ?

সে কবি কোথায় আজ, 'হলদে প্রজাপতি' যার লেখা ?
তার কি স্মরণে আছে একদা সে লিখত কবিতা ?
যেখানেই থাক, সে তো কোনোদিন জানবে না আর
কোনোদিন জানবে না একদিন দু'জন যুবক
ভালবেসে পড়েছিল তারও লেখা সারারাত জেগে।

সাফল্য

বসা চোখ, চোয়ালটা ভাঙা
একটা-দেড়টা অব্দি রেস্তরাঁয়
তর্কটা মুলতবি রেখে
ফের আবার পাঁচটা পাঁচিশে
কফি হৌসে আর ভাল নয়।

জলে ভেজা, রোদে আধ-পোড়া
ছেঁড়া চটি পরে দিগ্বিজয়
বুক রেখে উলঙ্গ বালিশে
সারারাত তেপান্তরে ঘোরা
কাজ নেই চন্দ্রোদয় দেখে

আর নয় সূর্যোদয় রাঙা।
পাঞ্জাবিটা ফর্সা রাখা ভাল
শুয়ে পড়া সকাল সকাল
ঘোরাঘুরি ছায়ায় ছায়ায়
ভয় কিবা রবীন্দ্র-সংগীতে

কবিতায় বসন্ত বাতাস
প্রাণে আর দেবে না মোচড়

একাসনে ইয়ার দোসর
যৌবনের দেবতারা আজ
বাড়িয়ে দেয় বুনিয়াদি হুঁকো।

তুমিও যে হয়েছ ঈশ্বর
সচন্দন গন্ধপুষ্পে বুঁদ
নিরিন্দ্রিয় আত্মাহীন এক
জড়পিণ্ড নশ্বর পাথর
সাফল্যের বিষদাঁতে হত।

বুদ্ধদেব বসু-কে

আশৈশব কবিতাকে ভালবাসি। অশান্তি-বিক্ষত
দারিদ্র্যপীড়িত মধ্যবিত্ত জীবনের বঞ্চনায়
অলক্ষ্যলালিত লক্ষ আশাবৃক্ষ হোক বাতাহত,

আত্মাকে যে দৈবী শূন্যে দ্রষ্টারূপে অবস্থাপনায়
সমর্থ হয়েছি, তা তো কবিতা দেবীরই আশীর্বাদে,
কথার মদিরা পান ক'রে, শব্দধ্বনি এবং মনন
উভয়ের অত্যাশ্চর্যে, সখ্যে আর দাম্পত্য বিবাদে
তৃতীয় পুরুষরূপে সুখী পরিবারে একজন।

যদিও কুমার আমি, মাঝে মাঝে ঈর্ষায় কাতর
হয়েছি, স্বীকার করি, কথাকল্পনার নিত্যনব
রতিসুখে। ভাবনাকে নিয়ে তাই আমিও বিস্তর
পাত্রী খুঁজে বেড়িয়েছি মনে-মনে। আয়ুষ্মতী ভব,
বলেছি সুন্দরীদের অপস্রিয়মাণ ছায়া দেখে।
বলাই বাহুল্য আমি দেখেছি, আঁকিনি কোনো ছবি,
এবং আঁকলেও তার শব্দরেখা ডেকেছে নিন্দেকে।
যে কবিতা পড়ে, পড়ে রোমাঞ্চিত হয়, সে-ও কবি
মূলত এ-ধারণায় ঘুরেছি কবির ঘরে ঘরে,
এমন কি বিদেশেও, তবে অধিকাংশ স্বদেশেই,
কেননা মাতৃভাষায় তরতম ঘটে সমাদরে।
আশৈশব কবিতাকে ভালবেসে বুঝেছি প্রেমেই
রূপ, কল্পনার তথা কবিতার আদি বাসস্থান।
যেহেতু আপনার কাব্য আমার চিন্তার সমর্থন
যেখানে প্রজ্ঞায় প্রেমে নেই বর্ণদ্বেষী ব্যবধান
তাই আনন্দিত চিত্তে সেই রাজ্যে করেছি ভ্রমণ।

হাওয়ার হাসি

সে বললে, দেখতে এসেছি।
কিছু বলব না, বলার নেই
কেননা, আমার পরিচিত শব্দগুলো
ব্যবহারে ব্যবহারে হেজে মজে গেছে।
ঘষেমেজে, বেনারসি শাড়ি পরিয়ে
প্রৌঢ়াদের টেনে আনব না
উজ্জ্বল আলোর নীচে, বাসরঘরে
কিশোরী যুবতীদের জটলায়।
তেমনি বেরসিক আমি নই। বরং
আটপৌরে লালপেড়ে শাড়ি পরে
তারা আমার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে
সুপুরি কুচিয়ে পান সাজুক।

উত্তরে, ওরা অনেকগুলি দাঁত দেখাল ।
ম্লান, যেহেতু ঠিক সেই সময়েই
হাওয়ারা হো হো করে হেসে উঠেছিল ।

সমতল

যতই বয়স বাড়ে ঈশ্বরের কাছাকাছি যাই
হাওয়ায় সমুদ্রে ভেসে দূরতম মেঘের ডানায়
একতলা দোতলা পাঁচ সাততলা সমতল দেখি ।
গম্ভীর কুঞ্চিত ভুরু কাঁদোকাঁদো অথবা ফিচেল
সব মুখমণ্ডলের ফ্রেমের আড়ালে এক শিশু
ফড়িঙের আলতো পাখা, পিঁপড়ের কর্মঠ ঠ্যাং ছিঁড়ে
গোঁয়ার গোবিন্দদাস ভাঙে দেখি সৃষ্টি মূল্যবান ।
তাদের হ্যাংলা দৃষ্টি প্রেস ফটোগ্রাফারকে খোঁজে ।

যতই বয়স বাড়ে ঈশ্বরের কাছাকাছি যাই
চন্দন ধূপের গন্ধ ঘন্টাধ্বনি অদূর মন্দির
শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, নিচু দরজা, আদি অন্ধকার
সকল ভালর ভাল সচকিত পুনর্দৃষ্টি লাভ
আবাদে ও মরুদেশে শুধুমাত্র রঙের তফাত ।

সংযোজনা-১

সূচিপত্র

দাঁড়াও

দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি হাঁপিয়ে উঠছি, আর
পারছি না দৌড়তে, একটু বসতে চাই, একটু হাঁটু মুড়ে
না হয় ঠেস দিয়ে ওই বটের গুঁড়িতে এই দু-চার মিনিট মাত্র
বসতে চাই কিম্বা দাঁড়াতে একটু দম নিতে দাও, দাঁড়াও না

পায়ের গুলিতে টান, বুকেতে প্রচণ্ড ব্যথা, ছাতি ফাটছে দারুণ তৃষ্ণায়

ছুটছি সকাল থেকে, ছুটে আসছি দাঁতে দাঁত দিয়ে।
তোমরা কেউ কেউ অন্য মোড় ঘুরে কোথায় পালালে
তোমরা অনেকে কত দূরে কত ছোটো হয়ে গেলে
এখনও দেখতে পাচ্ছি ছুটে যাচ্ছ, ছুটে যাচ্ছ, ছুটে যাচ্ছ। থামো।

এখন পড়ন্ত বেলা, তারপরই ধুধু অন্ধকার।
বটতলার ছায়া, ঘুম, শিকড়ের মাকড়সার জাল।
আমিও ছুটব, আমি তোমাদেরই সঙ্গে সঙ্গে যাব
থামব না। আমিও যাব, আমি যাব, আমি যাব, একটু দাঁড়াও।

ফেরার পথে

এই পথে যদি কেউ আসেই আবার
তাকে বোলো
যদি কেউ ভালবাসে গাছের ছায়ায়
আলোর আলপনা ঘাসে বাতাসের ঢেউ
তাকে বোলো
দূর গ্রামে কেউ নেই আর
পুকুরের পাড়ে বউ তেঁতুলতলার হাট
কপাট সিঁদুরমাখা ছবি আঁকা মাদারের ফুল
কিছু নেই ধুলোর চিৎকার।

এই পথ যাবে শূন্যে অরণ্যের নিরুদ্দেশে যাবে
হারাবে ভীরুতা প্রেম স্নেহের শপথ মাটি
মমতার খুঁটিনাটি বাগানের পরিপাটি মুখ
হারাবে ছড়াবে সবই রেখে যাবে মুক্তির অসুখ
রিক্ততার বেদনার চিহ্ন চেতনার।
তাকে বোলো।

হতভাগ্য

প্রেম থেকে পেল না কিছুই
যেহেতু সে প্রেমিক ছিল না,
বধিরের কাছে সঙ্গীতের
দাম যেমন একচুলও না।

শরীরের দুর্মর অভ্যাসে
অন্য কোনো ব্যাকুল শরীরে
খুঁজেছিল শরীরেরই স্বাদ
পেয়েছিল লবণাম্বু শুধু।

অথচ সে দিয়েছিল তাকে,
নিবিড় কল্যাণী সেই নারী,
মৃন্ময় কলস থেকে তার
অফুরন্ত পরিস্রুত বারি।

লোলুপ কলুষ তার হাতে
পাত্রটাই হল চুরমার
হেথা নয়, অন্যখানে বুঝি
জল আছে, দেহের জোয়ার।

সমুদ্র দিয়েছে তাকে তিমি
হাঙরের কুমিরের দাঁত।
অপঘাত মৃত্যু হল তার
যেহেতু সে প্রেমিক ছিল না।

ব্যস্তবাগীশ

হন্তদন্ত হয়ে হাওয়া ছুটে এল আমার গলিতে।
কড়া নাড়ল। দাঁড়াল না। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই
আখাম্বা গলায় বলল, মেঘ খুব জমেছে পশ্চিমে।
বলেই, একটু না-দাঁড়িয়ে, চলে গেল সটান পুব দিকে।

ঝগড়া

বিকেলে দিঘির জলে নেমেছিল আশ্চর্য আলোক।
দিনটা মেঘলা ছিল, বাতাস বইছিল সুশীতল।
স্নিগ্ধ স্নায়ুমন নিয়ে ঈশ্বরের নাম করতে যাব
এমন সময় কার বঁড়শিতে ধরা পড়ল রুই।

টুরিস্ট

প্রাচীন শহর কিছু থাকা ভাল।
অস্থিসার অট্টালিকা, ঘিঞ্জি গলি, ধুলো
ক্ষয়প্রাপ্ত শিবলিঙ্গ, এক্কাগাড়ি, ভাঙা সিঁড়ি আর
ধূপ চন্দনের গন্ধে পূজারত বৃদ্ধ পিতামহী।
লাক্সারি বাস থেকে নেমে স্মৃতিদীর্ণ হওয়া যাবে বেশ।

অন্ধকার

সব থেকে অন্ধকার নেমে এল সেদিন দুপুরে।
আকাশে দাউদাউ সূর্য যথাশক্তি আলো ছড়াচ্ছিল,
মেঘের ইশারা কিছু ছিল নাকো আবহবার্তায়।
কিন্তু শোনা গেল ফের দাঙ্গা শুরু হয়েছে প্রবল।

জুঁইফুল

অকালেই শেষ হল দিন
অভিমানী দুপুর আবার।
আসবে কি প্রভাত নবীন
অকালেই শেষ হল দিন
মেঘে মেঘে আকাশ মলিন
বাতাসের বুকে গুরুভার।
কুয়াশায় হতাশায় লীন
জুঁইফুল, হৃদয় তোমার।

জলের আগুন

ওই দ্যাখো ওরা যায়, ওরা প্রেম করে
শরীরে শরীরে ঢেউ তুলে ।
ছড়িয়ে রজনীগন্ধা ইটের শহরে
পলাশে বকুলে ।

নিলাজ, লাজুক তবু ; প্রেম করে ওরা ।
জ্বলুক, হাজার চোখ জ্বলে ।
হৃদয় আড়াল করে অন্ধকারে ঘোরা
সাজানো জঙ্গলে ।

ওরা অন্য বন্য জীব, ওরা করে প্রেম
মানে নাকো নিয়মকানুন ।
শরীরে শরীরে ঢেউ, ঘুচাবে অপ্রেম
জলের আগুন ।

দুপুর থেকে সন্ধ্যায়

দেখলুম ঘাসের থেকে কবিতার জন্ম হচ্ছে ; পাখি
অনায়াস ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে নীল সিন্ধুপারে,
মেঘ যেন পোষা ঘুড়ি, বাঁধা আছে নিশ্চিন্ত লাটাইয়ে
নির্ভার কথায় ফুল ফুটে উঠছে নির্মল বিবেক ।

ছুটির দুপুরভোর ঘুরলুম তোমাদের গ্রামে
সাত-আট মাইল মেঠো রাস্তা ধরে, পথের দু'ধারে
দেখলুম এখনও ধান যথারীতি সাবেক কালের,
একলা পলাশ, নিম বাঁশঝাড়ে গোপন বাতাস ।

সন্ধ্যায় বই বন্ধ করে দাঁড়িয়েছি ঝুলবারান্দায় ।
নীচে অবিশ্বাস্য আলো, বিজ্ঞাপনে অদ্ভুত মলম,
রহস্যকে তাড়া করে নিয়ে আসছে সবার সমুখে ।
এখানে ধরবে না শ্যাওলা, শুধু ঢেউ নামগোত্রহীন
এবং অথই জলে দুপুরের কমলেকামিনী ।

এখন বুঝি

এখন বুঝি সাদা পাতার রহস্য।
একটু আঁচড়, দেখা যায় না এমনি রেখা,
গেরি মাটির ঝাপসা রঙের আলতো বাঁকের
পাশেই হঠাৎ দগদগে এক ধ্যাবড়া সিঁদুর ;
অনেকখানি শূন্য জুড়ে একটুখানি।

একটি পাখি সিঁদুরে বুক অনেকখানি শূন্য জুড়ে
এতই কাছে কতই সহজ সরল রেখায়
মাইল মাইল অবলীলায় দৌড়ে চলি।
দু'পাশে মাঠ, ফসল কাটা, চিকচিকে জল ভরা শীতের।

এড়িয়ে চলি দোয়াত উপুড় কালি ঢালা
রূপ ঝলমল রাজার বাড়ি।
সোনার দাঁড়ে রুপোর বাটি, নানা রঙের
পাথর খোদাই টুকটুকে ফল সুঠাম দেহ মাংসমেদে।
অনেকখানি শূন্য জুড়ে দগদগে এক ধ্যাবড়া সিঁদুর
এখন বুঝি সাদা পাতার রহস্য।

নিমগ্ন

দেয়াল থেকে উধাও হল ক্যালেন্ডারের পাতা।
বদলে গেল ছবি, এবার আকাশ ছোঁয়া বাড়ি
উৎসাহিত পথিকজন, উদ্ভাসিত আলো।
কিন্তু আমার মনে আমার ভিন্নমুখী মনে
থমকে আছে তুষারশাদা পাহাড় ফেব্রুয়ারি।

কে যেন কাকে বলছে কবে আবার দেখা হবে।
ট্রেনের ধোঁয়া মিলিয়ে গেল দাঁড়িয়ে থাকে একা
নাম-না-জানা ইস্টিশানে মধ্যরাতে শীতে।
কে যেন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে পিছন ফিরে একা।

সে আমি নই ; প্রতিশ্রুতি দিইনি, প্রতিশ্রুত
থাকিনি তবু কোথায় যেন ডেকেছে নাম ধরে
চেনা গলায় কাছেই কেউ ডেকেছে নাম ধরে।
ডেকেছি নাম ধরে আমার নিজেরই নাম ধরে।
থমকে আছি তুষারশাদা পাহাড় ফেব্রুয়ারি।

প্রৌঢ়

এখন বাড়িতে বসে কাটে
বিকেল আর অস্থির নয়,
ছোটে না উত্তেজনার হাটে ;
নিখর্চায় বিকেলটা কাটে ।

কী হবে বেড়াতে গিয়ে মাঠে
ঘাস চিনেবাদামের ভয় ।
শীতের সন্ধ্যায় ধোঁয়াটে
কম্বলেই ঈশ্বর আশ্রয় ।

হল না কিছুই আজ

হল না কিছুই আজ ।
আমন্ত্রিত সুন্দরীরা এসে চলে গেল
কুটিল কটাক্ষ হেনে অসন্তুষ্ট শীতের হাওয়ায়
মাঝরাতের অন্ধকার শূন্যতায় দূরে ।
রেখে গেল বিস্রস্ত শয্যায়
অর্ধমৃত একটি প্রেমিক ।

হল না কিছুই আজ
নৃত্যগীত মান-অভিমান ।
ভগ্নোদ্যম শব্দসুন্দরীরা
রেখে গেল বিস্রস্ত কাগজে
কয়েকটি দুর্বোধ্য রেখা
পরস্পরবিরোধে কুটিল ।
রেখে গেল হৃদয়ে আমার
দলিত মথিত সুর ।
মৃত্যুহিম তীব্র হলাহল ।

একদিন দেখবে

**একদিন দেখবে একা ঘুরছ এক আজব শহরে,
সব মুখ অন্য মুখ কোনো দৃশ্য পরিচিত নয়,
বেতাল বিবদমান শব্দগুলো হিংস্র মারমুখ,
পানশালায় ঢুকতে গেলে বন্ধ হয় তখনই কপাট ।
এমনকি রাস্তাগুলো ঘুরে ঘুরে কেবলই ঘোরায়**

অস্পষ্ট আলোয় এক ব্রাহিস্বর নিলাম বাজারে।
যদি বা সঙ্কোচ কাটিয়ে প্রশ্ন করো, বলি ও মশাই,
কোথায় তেরোর-দুই বীরু দত্ত লেন কি জানেন ?
হা হা করে হেসে উঠবে সাত পাড়া কাঁপিয়ে সবাই।
তখন হনহন করে এগিয়ে গিয়ে দেখবে রাস্তাটা
একটা পাঁচিল জাপটে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে হঠাৎ।

কিন্তু ঠিক সেই সময় সব থেকে কাছের দরজাটা
যদি ঠেলে ঢুকে পড়ো, সবিস্ময়ে দেখবে সম্মুখে—
দেখবে আছেন বসে সিংহাসনে স্বয়ং ঈশ্বর।

টান

কিছুই টানে না আর, টেনে নিয়ে যায় না সাগরে।
পুকুরে, ডোবায় কেউ, বড় জোর নদীর কিনারে
যাবার প্রত্যাশা এনে মাঝপথে দারুণ হাঁপায়।
দেখে কষ্ট হয় বড় ; বলি আচ্ছা, আসব অন্যদিন।

আবার শহরে ফিরে কড়া নাড়ি : অমুক আছ হে !
আছে। বেঁচেবর্তে আছে। চোখে কিন্তু জ্যোতি নেই আর
যদিও ভেঙেছে হাল, দড়াদড়ি খেয়ে গেছে কীটে,
নৌকোর পাটায় গর্ত, পালে ফুটো, দিক বদলেছে।

আরেক পাড়ায় যাই, উঠতি মাঝিমাল্লাদের ঘাটে।
দেখিয়ে ন্যাংটো পাঁজরা টানটান মালকোঁচা আঁটে
চোয়াড়ে ছোঁড়ার দল। তারপর চড়াদর হেঁকে
ডাঙায় ডিগবাজি খেয়ে ট্যাক থেকে বের করে বেঁকে
কোথায় সাগর, এক সাগরের ছবি এলেবেলে।
সাক্ষাৎ সঙ্গম নাকি মারাত্মক রকম সেকেলে।

কিছুই টানে না আর, টেনে নিয়ে যায় না সাগরে।

অসম্ভব

ভালবাসা এখনও সম্ভব হয়তো নিম্ন-তফসিলবর্ণিত বস্তুগুলি ;
নিজের টবের ফুল, খাঁচার শালিক ময়না, পালিত কুকুর,
সমুদ্রে সূর্যাস্ত, হ্রদে চন্দ্রোদয়, জানালায় বৃষ্টির টোকা

ইত্যাদি ও ইত্যাকার।
সবথেকে কঠিন আজ মানুষের প্রতি প্রেম রাখা,
মনুষ্যসৃষ্টিকে কিছু অনাবিল ভাবে ভাল লাগা।
ভয় নয়, ভক্তি নয়, দয়া কিম্বা অনুকম্পা নয়,
আপস রফায় শুধু সহ্য করা নয়
পরস্পরের চোখে চোখ রেখে প্রাণ খুলে হাসা কিম্বা কাঁদা
সবথেকে কঠিন যদি কবিতাও নয় দৈববাণী।

কোলের শিশুও আজ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রয়েছে।

জানলা

জানলা বন্ধ করলেই আমার ঘর
আলোয় ভরে ওঠে।
শহরের রাস্তায় আমি আস্ত অরণ্যকে
টেনে আনতে পারি।
যে-সব মণিমুক্তো রূপকথার পাতায় লুকিয়ে আছে
মুহূর্তেই লুঠ করে আনতে পারি তাদের প্রত্যেকটিকে।

অনেক কিছু পারি আমি
জানলা বন্ধ থাকলে অনেক কিছু, অনেক কিছু।
অসম্ভব লম্বা মিনারের গা বেয়ে ওপরে উঠতে
কিংবা সমুদ্রকে কোনো ছায়াশরীর নারীর মধ্যে
সংহৃত করা, তাও আমার অসাধ্য নয়।
এমনকি, একশো বছর আগে কি তারও পূর্বে
যে-সব যুবকেরা ক্রমশ ম্লান হয়ে মারা গেছে
তাদেরও টেনে আনতে পারি—
কফির আড্ডায় একালের সাহিত্যিক বিতর্কের মধ্যে।
কিন্তু জানলা খুলে দিলেই
আর পাঁচজনের একজন আমি।
হা অদৃষ্ট
কিছুতেই আমি জানলা বন্ধ করতে পারছি না।

সমুদ্র

দাও তাকে সমুদ্র সঞ্চারী
দাও মৎস্যনারীর ক্ষিপ্রতা ;
এই রাত একান্তই তারই
এই আকুলতা।

আবর্তের উন্মাদ যৌবন
হোক তার, হোক, তারই হোক,
নিভে যাক উদগ্রচেতন
পার্থিব আলোক।

অন্ধকারে মুছে যাক তার
রূপরঙ গন্ধের নিবিড় ;
হোক তার দেহের জোয়ার
আমার শরীর।

মনে মনে

যেমন চোখ দিয়ে গড়ন, রঙ
ভিন্ন আর কিছু দেখা না যায়,
দৃশ্যজগতের সীমানা ছেড়ে
তবেই ভাবনার অতলতায়,

তোমাকে পাব বলে তেমনি আমি
তোমাকে ছেড়েছি, হে প্রাণেশ্বর,
আমার নিমীলিত প্রোষিত আঁখি
অরূপ ছায়াকেই করেছে ভর।

মেঘের পর মেঘ জমেছে ঢের
আঁধারও যথারীতি ঘনিয়ে আসে,
বৃষ্টি চাই যেই, বৃষ্টি হয়,
দীঘল জলধারা মাটিতে ঘাসে।

এমন অকৃপণ শ্রাবণ ঋতু
তোমাকে দেব বলে, প্রাণেশ্বর,
গভীর দূরে থাকি, প্রোষিত আঁখি
স্বপ্নে মিথ্যায় বেঁধেছি ঘর।

স্বপ্নে মিথ্যায় বেঁধেছি ঘর ?
তা হলে সত্যের নিবাস কই ?
শুধু কি রঙেচঙে আড়ম্বরে ?
তোমার সুখ নেই সঙ্গ বই ?

শহরে বহুদিন ঘুরেছি আমি
ছুঁয়েছি উঁচু উঁচু নকল স্তন ;
শুনেছি ঝকঝকে চতুর কথা
এবং মার্জিত উচ্চারণ ।

দেখেছি পলাতক নিজের থেকে
সবাই ভিড়ে সভা-সম্মেলনে ।
তাই তো চাই আমি প্রাণেশ্বর
তোমাকে সুদূরের সঙ্গোপনে ।

বাহ্য

কোন খানে তুমি লুকিয়ে রেখেছ
রসের কলস
খুঁজব না আমি ইতিউতি, শুধু
চোখের অলস
দৃষ্টিতে যদি পাওয়া যায় কিছু
থাকব তা নিয়ে ;
বলব না লোকে যা যা বলে থাকে
ইনিয়ে বিনিয়ে ।
আমার এখন সেটুকুতে লোভ
উপর তলায়
হঠাৎ বাঁকের ঈষৎ আভাসে
যেটা পাওয়া যায় ।
তাই নিয়ে খুশি থাকব এবং
থাকব সরস ।
খুঁজব না কোনো গোপন গভীরে
রসের কলস ।

লোহা

কতটা কার্বন আছে ? ক্রোমিয়ম, টাঙ্স্টান আর
সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ ?
এ লোহা কি জলে শক্ত ? নাকি তেলে ? বয়সে ? হাওয়ায় ?
এমন অর্জুনকান্তি সে কি নুনজলের আদরে
অথবা জন্ম বুঝি ঠাণ্ডা টানে, রমণীয় ছাঁচে ?
ছোঁয়াই কপালে, ঠোঁটে, গালে, ঘাড়ে, চোখে, চোখ বুজে

বুকে ও বুকের হ্রদে। এই বুকে অনেক অসুখ
অনেক অনেক টন টানটান, খানখান হয়ে
অন্ধকারে ডুবে যাই, ডুবে থাকি গভীর খনির
চিল স্তব্ধতায় নীল মৃত্যুর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে।
এ-লোহা কি জলে শক্ত ? নাকি তেলে ? বয়সে ? হাওয়ায় ?
হয়তো বয়সে।
না হলে এ-ওঠানামা, নামাওঠা, কপিকলে আড়িয়া হাফিজ
নাবিক, মেহেদি দাড়ি ; রুটি চিজ, ঝলসানো মুরগির ঠ্যাং
আহা রে বিয়ার ঠাণ্ডা, বেঁটে বেঁটে বোতলের মাল
বেজন্মা খানকির ছেলে ইত্যাকার কথা, খাদ্য, কাজ সব ফেলে
যতটা সম্ভব ঘাড় খাড়া করে লুঙ্গি পরে থাকা
সহজ হত না আজ, সহজ হত না আজ কিছুতেই সহজ হত না
যদি না এ লোহা, এই খনিজ সঙ্কর ধাতু মন
সব উচাটন ভুলে ঝেড়ে ফেলে শক্ত হত সমুদ্রগর্জনে
ভেসে আসত, ডুবে যেত, ভেসে আসত প্রেতের জাহাজ
অক্টোপাস, হাঙর কুমির সেই মেয়েটি কি মেয়েটির ঘাড়
যতই কার্বন থাক ক্রোমিয়াম, টাঙ্স্টান আর
সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ।

দেখেছিলুম

দেখেছিলুম হ্রদের ধারে ছবির মতো অনেক বাড়ি
রঙের খেলা ফুলের মেলা অপ্সরীদের আয়ত চোখ।
সবুজ লনে শালিক-চড়ুই রেলিঙ-ভরা ঝুমকোলতা !
যেতে যেতে দু'চোখ ভরে দেখেছিলুম সুখী মানুষ।

দেখেছিলুম সদ্যকেনা টুসটুসে লাল গাড়ির ভিতর
একমাথা চুল পুতুল পুতুল ছোট্ট মেয়ে ঝলক খুশি।
প্রেম দিয়ে ফের ছোঁয়ার আগেই অনেক দূরে ঝাপসা ধোঁয়া
চোখের মধ্যে ঘন্টাখানেক অতুল পুতুল নাচ থামেনি।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে শুনেছিলুম ভেসে আসা
সেতারে কার সুরসাগরের ঢেউয়ের তালে গুমরে ওঠা।
বুকের মধ্যে উদাস উদাস হাসির মতো কান্না নিয়ে
দাঁড়িয়েছিলুম পথের ধারে অনেক হয়ে একা একা।

হ্রদের ধারের বাড়িতে কেউ ডাকবে না তো নিমন্ত্রণে।
বসব নাকো নরমগদি ঠাণ্ডা গাড়ির মেয়ের পাশে ;

আঙুল আমার তারে তারে তুলবে না সুর কোনো কালেই
কিন্তু আমার ভাল লাগায় ফাঁক ছিল না, ফাঁক ছিল না।

ব্যবধান

তোমাদের গাঁটগুলো,
ক্ষমা করো, বানানো বলেই মনে হয়
এমন সাহিত্য-ঘেঁষা নিরাপদ।
আমাদের জটিলতা পরিশুদ্ধ ছিল
ইতিহাস সাক্ষী দেবে।
এ-সব ধারণা কিছু পাকাচুল হয়তো বা। তবু
তুমি যত কুয়াশায় আমি হই সূর্যের শরীর।
সেটাই ভব্যতা তাই সরে যাই পশ্চিমের
ভাঙা বারান্দায়।
দেখি না কিছুই দেখি স্বপ্নে দেখি আমারই আভায়
তুমি দূর গ্রহ ঝিকমিক।

ঘোড়া

ঘোড়াটা মুখ নিচু করে শুকনো ঘাস চিবুচ্ছে একমনে।
গলায় লাগাম নেই। সারাদিন খাটাখাটনি গেছে।
রাস্তাটাও এবড়ো-খেবড়ো ছিল, খানাখন্দে ভর্তি।
একটা উঁচু ঢিবি পার হতে মেহনত হয়েছিল খুব।
দু'চার ঘা চাবুকও জুটেছিল, অশ্রাব্য অনেক গালাগালি।
কিন্তু ফেরার পথে দিঘিটার জল খুব ঠাণ্ডা ছিল
আর কাঁঠালের পাতাগুলো মিষ্টি লেগেছিল বেশ।

বিশ্রামটা আর একটু দীর্ঘ হলে ভাল হত।
আবার কেন যে সেই এক দঙ্গল সোয়ারি মাঝপথে।
ফের সেই ছুটোছুটি, রোদ, ঘাম, মুখের ফেনায় লোনাস্বাদ
লেজের উপরে মাছি, ঘাড়ের উপরে ডাঁশ, ক্ষুরে ক্ষুরে ব্যথা, জ্বালা, তাপ।
কিন্তু এই ফিরে আসা, শুকনো ঘাস, দিশি মদের দোকানে চিৎকার,
আধো অন্ধকারে পেঁয়াজি ভাজার গন্ধ এসব যে ভাল লাগছে
তা শুধু কর্তব্য কর্ম ঠিক ঠিক করা গেছে বলে। তাই নাকি?
উপরি পাওনা হিসেবে মালিক
পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেছে।
আর কিছু লভ্য নেই
আর কিছু লভ্য নয়
এই অভিজ্ঞান নিয়ে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুপ করে ডুবে যায় ঘুমে।

নীড়

ও পাখি কাঁদিস কেন
বুঝি তীর বিঁধেছে হৃদয়ে
প্রণয়ে ধরেছে চিড়
ভেঙে গেছে সুখনীড়
দুরন্ত প্রলয়ে ।

বুঝি তোর ডানাজোড়া
সময় করেছে খোঁড়া
গোপনে গোপনে ।

আকাশে অনেক দূরে
একাকী বেড়াস উড়ে
তবুও পিছনে

ফিরেছে পেয়াদা জরা
যত বাঁচা তত মরা
রাত্রি আর দিন ।

সব আশা ভাঙা বাসা
বিনশ্বর ভালবাসা
স্মৃতিও মলিন ।

ও পাখি তবুও আছে
আমারই এ ছোট গাছে
তোর তরে এতটুকু ঘর

ও পাখি কাঁদিস কেন
এইখানে রাখ তোর স্বর ॥

পাখি

কাছে এলে অস্পষ্টতা তেলরঙ ছবি ভয় ভয়
দূরে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা,
ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ধুলো অতিবাহিত সময়
চাকার অপটু আলপনা ।

যে-পাখি ডানায় তার বচন-অতীত অনুভবে
প্রত্যক্ষ করেছে লক্ষ শীত,
তার বক্ষলগ্ন হয়ে দেশান্তরে উড়ে যাব কবে
ত্যাগ করে বিমল পিরিত ?

এই সন্ধ্যাবেলা ওই নিশীথের মাতাল মাদলে
আগামীর ভোর জগল্লীন :
ছড়িয়ে রয়েছে স্থির চারুকলা তিনভাগ জলে
বাদবাকি মাটিতে মলিন ।

তারা ফিরে যাক যারা ভালবাসে নিজ বিছানাকে,
ঘাটে ভিড় ব্যস্ততা সন্ধ্যার,
জলে কি মাটিতে নয় আকাশেই পেয়েছি তোমাকে
পরিপূর্ণ পাখি শূন্যতার ।

অন্য অন্ধকার

এখানে মাটির দরে অন্ধকার ভাড়া পাওয়া যায়—
সাবেক গলির পথে জয়ঢাক বাজছে শুনলুম :
এখানে নিলাম-দরে অন্ধকার ভাড়া পাওয়া যায় ।

বড়ই ক্লান্ত দেহ সারাদিন সূর্যের প্রহারে ।
একটি দোকানে ঢুকে, 'ভাড়া নয়, কিনে নিতে চাই
ধামায়, কলসিতে যত অন্ধকার আছে,' বললুম ।

হরেক নমুনা দেখি, কিন্তু কই মনের মতন ।
শুধু নামান্তর, সেই একই মাল বিভিন্ন ঠোঙায় ।
কোথায় আমি যা চাই, স্বপ্নপ্রসবিনী অন্ধকার ?

'সব অন্ধকার কিছু শিশুর চোখের মতো নয়,
সব অন্ধকার মুগ্ধ ঈশ্বরসান্নিধ্য কিছু নয় ।
আমরা এখানে শুধু কূপের আঁধার বেচে থাকি ।

'ঈষৎ ঝাঁঝালো এই অন্ধকার ভীষণ মধুর ।
মুহূর্তে অনেক হবে বিবিক্ত যে, একা, অসহায় ।
ঘরের ঘোমটা খুলে ছুটে আসবে সবাক চত্বরে ।

'বলুন, দরকার আছে, সংক্রামক এই অন্ধকার ?
আসুন, নিদেনপক্ষে, পোয়াটাক নিয়ে যান ঘরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা চিন্তা ভয় বেমালুম চিৎপাত হবে।

'কেবল থাকবে ঘৃণা বিদ্বেষের গরল সর্বাঙ্গে
উথলে উঠবে থুথু, চোখে রক্ত, দাঁতে সর্বনাশ।
আসুন, নিলাম-দরে অন্ধকার কিনে নিয়ে যান।'

যতই বলি না কেন প্রয়োজন নেইকো আমার।
হাত ধরে টানে কেউ, ঠ্যাং ধরে ঝুলে পড়ে থাকে
আমার হৃদয়ে ঢের শ্বেত-পাপড়ি অন্ধকার আছে।

সাবেক সমালোচকের দৃষ্টিতে

কেমন অবাধে এরা ফলাফলহীন পদ্য লেখে!
ছাঁচের পুতুল সব চোখ নাক অতীব নিখুঁত
অথবা সেই যে ছবি পার্কের রেলিঙে টাঙানো
নদী নৌকো বাঁকা চাঁদ ওঁ খাড়া নারকোল গাছ।
কেমন অবাধে এরা পরিণামহীন পদ্য লেখে।

যেমন সহজে আজ ইতস্ততঃ নিবীহতমাও
দেখায় অনেকটা পিঠ, কিছু পেট, নিম্ন বাহুমূল,
তেমনি কয়েকটি শব্দ অকারণ পুলকে হামেশা
সদর রাস্তার মোড়ে শিস দিয়ে কোমর দোলায়।
যদিচ পথিকজন আসক্ত কি বিরক্ত হয় না।

কেমন সহজে এরা বাছা বাছা কথা ছুঁড়ে দেয়
বাস থেকে নেমে ছেঁড়া চটকানো হলদে টিকিট :
মানুষকে ভালবাসো, আলো চাই, গরিবের রুটি
ইত্যাদি শাশ্বত সত্য অনির্বাণ উঁচু বিজ্ঞাপনে
নিভাঁজ সুন্দরী তার সব ক'টা দাঁত নিয়ে হাসে।

বরং পছন্দ দম-ফুরিয়ে-যাওয়া তোবড়ানো গাল
আলুর পুতুল কোণে ফুল আঁকা পুরনো পেটরায়
সুখে থাকো আরশিতে ফিকে গন্ধ ন্যাপথলিনের।

গুরুঠাকুরের ভাষণ

দাঁড়কাকে ঠুকরে খাবে নিতম্ব তোমার
ক্রিমিকীট বাসা বাঁধবে জ্যামিতিক খাঁজে,
থাকবে না একটুও ঝাঁজ তীক্ষ্ণ রসনার
সব রস নিঙড়ে নিলে যেমন পেঁয়াজে ।

অতএব আরশি রেখে পার্শ্ববর্তীটিকে
অবুঝ খুকির মতো আঁচড়াও কামড়াও,
যতক্ষণ আকাশের রঙ থাকবে ফিকে
রভসে গোঙাও ফের রভসে গোঙাও ।

ভোরবেলায় শুনতে পাবে পাখি ডাকছে ডালে
সেই যে ত্রিকালদর্শী ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি :
বলছে, ঢের দুঃখ আছে তোর পোড়াকপালে
ব্যঞ্জনে অরুচি ধরবে, পাতে করবি বমি ।

তখন চৈতন্য হবে, দেখবি অমৃত
এনেছে সামান্য চাল, কলা ও বাতাসা ।
বুঝবি এ-মনুষ্যজন্ম সুপরিকল্পিত
কৃষ্ণ ভজবার জন্যে সংসারেতে আসা ।

পলাতক

যুদ্ধে কখনও ছিলুম না তবু
আহত হয়েছি, বন্ধু হে,
নিভেছে যখন হাজার হৃদয়
ঘৃণ্য লোভের ফুঁয়ে ফুঁয়ে ।

মন করেছিল অস্ত্রের খোঁজ
দেখেছি যখন প্রিয়জনে
একে একে এসে প্রাণ দিয়ে রোজ
ছিঁড়তে পারেনি বন্ধনে ।

ধন্য তাদের মৃত্যু জেনেও
কাপুরুষ আমি নিতান্ত
স্বীয় শক্তিকে করে সন্দেহ
খুঁজেছি সুদূর বনান্ত ।

বলা বাহুল্য শান্তি পাইনি
অরণ্যনীলপর্বতে
চতুর কথার ঢের বিকিকিনি
করে শিল্পীর গর্বতে।

বিষিয়ে উঠেছে নিশ্বাসবায়ু
নিজ রক্তের ব্যবহারে,
প্রকাণ্ড বোঝা যেন পরমায়ু
অসীম আত্মধিক্কারে।

তাই কার মৃত হৃদয়কে নিয়ে
ঘুরে মরি আজ পথে পথে।
আসবে কি কেউ শকট থামিয়ে
নিয়ে যাবে বলে হতাহতে?

সে

আগুন জ্বেলে রেখেছে তিন
ধূলিমলিন দেয়ালে।
কেননা তার হৃদয়ে আর
সিংহ নেই,
শেয়ালে
বেঁধেছে বাসা ঘুরছে খাসা
গর্ত খুঁড়ে
খেয়ালে॥

একদা তার খাদ্য ছিল
কী জ্বলন্ত আগুন-ই!
বিদেশি রাজা হরেক সাজা
দিয়েই ভয়ে
বেগুনি,
যেহেতু তার মনের ধার
বেঅনেটের
দ্বিগুণ-ই॥

সঙ্গী ছিল বৃষ্টি ঝড়
রিভলভর প্রতীতি:
যে-ভাবে হোক শোষিত লোক

দেশের ধন
প্রভৃতি
বাঁচাতে হবে, আনতে হবে
সমাজমনে
সুনীতি ॥

বস্তি মাঠ কারখানায়
জনগণের সভাতে
রাত্রি দিন শরীর ক্ষীণ
হয়েছে হাড়-
হাবাতে,
হয়নি স্থির টিকটিকির
অবিশ্রাম
হানাতে ॥

হেঁকেছে চাই প্রত্যেকের
ভাতকাপড় শিক্ষা,
সুযোগ মান সব সমান।
নয়কো আর
ভিক্ষা।
শপথ করো অস্ত্র ধরো
মরণপণ
দীক্ষা ॥

মানেনি কাল, সর্পগতি
গুপ্তঘাতী ছুরিরে।
ছন্নবাস পউষমাস
যখন এল
শরীরে,
রক্তে তার ভরাজোয়ার
হৃদয় রাঙা
আবীরে ॥

বলাই বৃথা, কখনও কোনো
চপল-আঁখি নারীকে
থাকেনি ধরে স্বীকার করে
হৃদয়ে জ্বর-
জারিকে।

'পাব তো সব সগৌরব
ইন্‌কেলাবি
তারিখে ॥'

উড়ল শেষে বহুদিনের
প্রতীক্ষিত প্রভাতে
পতাকা তিন রঙে রঙিন
রাস্তাঘাটে
সভাতে ।
'অথচ তার মনের ভার
সে যেন আজ
তফাতে ॥

সর্বদাই ঘরেতে খিল
চতুর্দিক বন্ধ
স্বপ্ন নেই, জেগে জেগেই
মনের সাথে
দ্বন্দ্ব ।
সত্যিকার অন্ধকার,
নাকি সে নিজে
অন্ধ ?

'মিথ্যা সব, মিথ্যা এই
বর্ণহীন আজাদি,'
বলেছে যেই সবে মিলেই
করেছে তাকে
তামাদি ।
'জেলের কীট থাকবে ঠিক
দেখাও ওকে
গরাদ-ই ॥'

শুষ্ককেশ, দন্তহীন,
নগ্নদেহ, দৃষ্টি
জ্বলছে যেন আগুন হেন
পুড়িয়ে দেবে
সৃষ্টি ।
যারাই যায় তারা বহায়
আঁখিজলের
বৃষ্টি ॥

পাগল এঁকে রেখেছে তিন
বিপ্লবীকে দেয়ালে,
তিনটি মুখ, চওড়া বুক
আগুন ঝরে
চোয়ালে,
আত্মহারা খেয়ালে যারা
দিয়েছে মাথা
কোটালে ৷৷

কলকাতা ১৯৬৮

কলকাতার রাস্তায় প্রতিদিনই
সংগ্রামের চিহ্ন পড়ে থাকে
ব্যর্থ সংগ্রামের ।
পরিত্যক্ত একপাটি জুতো
পিষ্ট হয় বাসের চাকায়
কাটা পড়ে ট্রামের লাইনে
দাঁতমুখ খিঁচিয়ে পড়ে থাকে ।

কিন্তু রক্ত ঝরে না কোথাও
এতটুকু রক্ত-ও ঝরে না
অথবা চোখের জল স্পর্শভীরু
ম্লান দর্শকের ।

সব কিছু নীরক্ত নীরস
নীরক্ত নীরস ।
কবিতাও ।
বাড়িগুলো বোবা, মানুষেরা
যন্ত্রের মতন ।
কিন্তু যেন সাবেককালের
কিমাকার যন্ত্রগুলো সব ।

জানি আমি যন্ত্রণাগুলোকে
ইতস্তত ব্যর্থতাগুলোকে
চাপা রাগগুলোকে কুড়িয়ে
দারুণ হাতবোমা এক তৈরি করা যায়
দারুণ হাতবোমা ।

মহাত্মাজি

জীবনে মাত্র একবার
কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে
তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, গান্ধিজি,
কোন সুদূর দুপুরবেলায়
সোদপুরের বাগানে।
জীবনের সেই অবিস্মরণীয়
দীর্ঘতম মুহূর্তে
চকিতে বুঝতে পেরেছিলুম
কেন তুমি মহাত্মা, কেন তুমিই।

দেখা ছিল জ্ঞানীর অহংকার,
ধনীর দাম্ভিকতা,
অন্তঃসারহীন বামনের পদমর্যাদার আস্ফালন
এ-সবই স্বীকার করে নিয়ে,
হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে থাকতেই অভ্যস্ত ছিলুম
যতক্ষণ না তুমি আমার ভয় ভাঙিয়ে দিলে

যে-কেউ তোমার কাছে যেতে পারত, গান্ধিজি
নির্ভয়ে, এলো গায়ে আপনজনের মতো —
যেমন আমি গিয়েছিলুম, আর
তুমি এসেছিলে তোমার দেবদুর্লভ
মধুর হাসি নিয়ে।

অসুখ

চারিদিকে পরিপাটি মানুষের ভিড়
অ-র পরে আ।
বাস চলে রুট ধরে—
ট্রাম চলে নিজের লাইনে
স্থবির গাছের ডালে
কাক ডাকে কা।
তবু দ্যাখো ভেলকিঅলা
ঠ্যাং তুললে আকাশের-পানে
ছেলেবুড়ো বলে বাঃ বা।

স্বাভাবিকতায় আর সুখ নেই
ক-র পরে খ।
বালিশ বিছনা ছেড়ে উত্তুরে হাওয়ায়
মাঠে যাই চ।

চাবি

পুরনো চেনা-বাজারে এই অলীক সন্ধেবেলা
ঘুরছি কানা অলিগলি একটি চাবির খোঁজে ।
তালা আমার বুকপকেটে দূরবছরের ভারী
কলকব্জা জীর্ণ তার মরচে ধরা মুখ ।
কোথায় সেই চাবিওলা, কোথায় চাবিওলা ?
গির্জেবাড়ির ঘন্টা বাজে ঢং ঢং ঢং ।

হিসেব

মুছে ফেলো রঙ
রঙিন চিত্র
জীবন তবুও
অতিবিচিত্র
অপরূপ তার
অধ্যবসায়
চিঠি দিয়ে আসে
ভুল ঠিকানায়
যারা আর নেই
দেবে নাকো সাড়া
তাদের পাড়ায়
কেন কড়া নাড়া
ঘরে-ঘরে সব
জানলা বন্ধ
দরজা ঠেললে
স্মৃতিকবন্ধ
ঘুম থেকে উঠে
ঘুমিয়ে পড়বে
শুধু আলোছায়া
হেলবে দুলবে
দেখবে অবাক
ভুতুড়ে চিত্র
ধন্য জীবন
তুমি বিচিত্র ।

অবসন্ন আছি বলে

অবসন্ন আছি বলে আসন্ন কিছুই নয় আর
রক্তের জঙ্গলে রাত্রে ডাকে নাকো জঙ্গি জানোয়ার।
আচ্ছন্ন তন্দ্রার মধ্যে শুনি ক্ষীণ কণ্ঠের ক্রন্দন
উপল-আহত গতি শীর্ণকায়া সুবর্ণরেখার।

অবসন্ন আছি বলে শব্দহীন প্রবহমানতা
জড়ায়, জড়িয়ে থাকে, শিরায় শিরায় তরুলতা।
যদিও একটি ফুল, একটিও, ফোটে না প্রত্যূষে
ছড়ায় যেসব পাতা, আমারই তা আমারই সব তা।

অবসন্ন আছি বলে রাত্রিদিন টুপ টুপ ঝরে
হলুদ, বাদামি পাতা, শুষ্ক পাতা সদরে অন্দরে।
শোনায় অনেক গল্প, রৌদ্র জল এবং বৃষ্টির
মাটির রহস্য কেন ঘনীভূত হয়েছে পাথরে।

অবসন্ন আছি বলে আড়াআড়ি আবও বেঁচে আছি
নিবিড়, নিবিড়তর সময়ের খুব কাছাকাছি
সবুজ শ্যাওলা হয়ে মন্দিরের ফাটলে ফাটলে।
হোক না নিস্তব্ধ তবু মধুচোর আমার মৌমাছি।

নিরাশ্রয়

গাছটা আমার কিন্তু ফুল ফোটে নিজের ইচ্ছায়।
অথবা ঋতুর রঙ্গ ? আমি আর ভাবতে পারি না।
কেউ কি স্বাধীন আছে এ-জগতে ? আমি কি স্বাধীন ?
এ-সব উৎকট প্রশ্ন কেবলই বিভ্রান্ত করে বলে
আমাকে তোমার হাতে সঁপে দিতে গিয়েছি একদা।
তিন পা পিছিয়ে, দৌড়ে, তবে ফের নিশ্বাস ফেলেছি।
আবার তোমার কাছে যাই যদি দেবে কি আশ্রয় ?
আমি বড় একা আজ, সহায় সম্বলহীন ঘরছাড়া।

পিত্রালয়

বাবা বহুদিন মৃত। ঠাকুর্দা তো স্মৃতিতে ধূসর।
আমিও হয়েছি পিতা, প্রৌঢ় পিতা।
এই পৃথিবীতে আজ সব থেকে নিঃসঙ্গ পিতারা।
বেঁচে আছি মৃত পিতা, বৃদ্ধ পিতামহের জগতে।

আয় তো বালক তোর মুখখানি দেখি কাছে আয়।
আহা, এ যে আমাদেরই ছাঁচেগড়া মুখ !
বল তোর কোথায় অসুখ
কী জ্বালা, কোথায় জ্বালা
কেন তুই বিবাগী বিমুখ।
ফিরে আয় পিতার হৃদয়ে।

আমাকে পুড়িয়ে তুই কোথায় বা যাবি এই শীতে।
সেই তো ফিরতে হবে, যেমন ফিরেছি আমি,
একদিন বাপের বাড়িতে।

আমার ছেলেকে : ১

তুমি ফল পাবে বলে
এই বৃক্ষ রোপণ করছি।
যখন সবুজ পাতা
ঝিকমিক করে উঠবে
শীতশেষ নরম রোদ্দুরে
তখন থাকব না আমি
তুমি থাকবে, বাতাসও থাকবে,
ক্ষণিক অচেনা পাখি
ডালে বসে ফের উড়ে যাবে।
রোজ একটু জল দিও গাছে,
জল দিও।

আমার ছেলেকে : ২

আমার শৈশবকাল কেটেছে খড়ের চাল মাটির কুটিরে।
খুপরি জানলা দিয়ে গন্ধরাজ ফুল দেখা যেত
আর খিড়কি পুকুরের জল একটুখানি।
দাওয়ার সামনে ছিল প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছ,
কিছু দূরে আম, পেঁপে এবং ডুমুর।
ডুমুরের ডালে ছিল রেশমিজাল রঙিন মাকড়সা।
ছিল দুটো পেয়ারার গাছও, একটা কাশীর,
তার মগডালে ছিল আমার গোপন আস্তানা।
সারাদিন অজস্র ফড়িং, প্রজাপতি
নাচত মেহেদি, রাঙচিতার বেড়ায়।
সকালে পাঠশালা সেরে দু'ঘন্টা পুকুরে হুটোপুটি

লক্ষ্মীগরু, কুচকুচে কালো, শুধু কপালটা সাদা,
চুল আঁচড়ে দিত সমাদরে খরখরে জিব দিয়ে তার।
সারাটা দুপুর কাটত তীরধনুক নিয়ে, ঢিল ছুঁড়ে
পাকা পেঁপে, তেঁতুল শিকারে।
বাতাবি লেবুর বল খেলতে খেলতে
বিকেলে আশ্চর্য আলো নেমে আসত কোন দূর থেকে
তারপর সন্ধ্যা ঝরত, কৃষ্ণকলি ফুটত আঙিনায়।
পোষা টিয়া বলত : কোথায় ?
কৃষ্ণ মথুরায়।
কৃষ্ণ কী করে ?
কৃষ্ণ গোধন চরায়।
কৃষ্ণ পাতকী তরায়।

বটতলা

তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ ? আমি সোজা।
তুমি ডান দিকে বুঝি ? তুমি বামে ?
যাও, ফের দেখা হবে
গ্রামের শেষপ্রান্তে বুড়ো বটগাছতলায়।
তখন সন্ধ্যা নামবে চড়ুইপাখির কলরবে :
ঢের অভিজ্ঞতা হল, আমি বলব ;
ঢের অভিজ্ঞতা হল, তুমি বলবে ;
ঢের অভিজ্ঞতা হল, বলব সবাই সমস্বরে।
আমাদের মধ্যে আর বিবাদ থাকবে না।

পিছুটান

ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ।
আমি যাচ্ছি, যাচ্ছে অনেকে।
সত্যিই যাচ্ছি কি আমি, ওরা যাচ্ছে ?
ধুলোয় ঝাপসা চোখ, তাপ বাড়ছে।
দূরে খেজুরের ঝোপ, দু'পাশে ক্যাক্টাস।
ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ।
যাও আমি বারণ করব না যদি
পিছু তাকাবার ইচ্ছেটাকে
একেবারে মুছে ফেলে দাও।
পরিত্যক্ত রাস্তাটার ধারে

আগাছার জঙ্গলে ফুটেছে
নামহীন গন্ধহীন ফুল
সে আমায় বিরক্ত করছে,
সে আমায় টানছে দারুণ।

পাঠক-তর্পণ

ক্বচিৎ চিলের মতো তীব্রবেগে
নীচে নেমে এসে
আমার হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে নিয়ে যাও
তোমার উদ্ধত উঁচু পাহাড় শিখরে।

এবং ভক্ষণ করো, তৃপ্ত হও।

নদীনারীবৃক্ষপর্বতের
ছায়ায় লালিত এই হৃৎপিণ্ড
অতীব সুস্বাদু,
আজন্ম জারিত করুণায়।
আমার রক্তের স্রোতে স্নান করো,
খাও খাও আমার হৃৎপিণ্ড খাও,
তৃপ্ত হও, হে পাঠক,
উদাসীন মিনারবিলাসী।

মাঝগাঁও স্টেশন

ক্রমশ সুস্পষ্ট হল দু'একটি তারা
সন্ধ্যা নামল মাঝগাঁও স্টেশনে।
মাঠের ওধারে দূরে ক্ষীণপ্রাণ লণ্ঠনের আলো
যেই না উঠল জ্বলে সার সার খোলার বস্তিতে
মাঝখানে অন্ধকার
সহসা দাঁড়াল খাড়া পাহাড়ের মতো খালি গায়ে।
একটানা ব্যাঙের ডাকে স্তব্ধতাকে দেখতে পেলাম
টানটান শুয়ে আছে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে।

আপাতত আমি একা। ফলত এখন
সব থেকে ভিড়াক্রান্ত ব্যক্তি আমি। অনেক অনেক
মুখের বিবর্ণ রেখা, পরিচিত কণ্ঠস্বর, শব্দময় দৃশ্যাবলি
আমার ডাইনে বামে মাথার উপরে।

মাঝরাতে ট্রেন আসবে, রোজ আসে,
অনেক মানুষ আলো কোলাহল চলন্ত উৎসব
সুতীক্ষ্ণ হুইসিল বাজিয়ে একটু না দাঁড়িয়ে চলে যাবে।

এ-স্টেশনে আর কোনো গাড়ি দাঁড়াবে না।

প্রস্থান

দেখেছি অনেক। দৃষ্টি
স্পর্শ পেয়েছি সব রকম হাওয়ার।
শুনেছি অনেক। শব্দ
শহরের সূর্যালোকে সন্ধ্যাকালে
এবং অনন্তকাল ধরে।
জেনেছি অনেক। থামা
জীবনের পথে পথে। অহো শব্দ মোহদৃষ্টি!
এবার প্রস্থান নব
প্রণয়ে কি আরেক ঝংকারে।

(র‍্যাঁবোর কবিতা অবলম্বনে)

জীবনানন্দ স্মরণে

'কো নু হাসো কিমানন্দ নিচ্চং পজ্জ্বলিতে সতি।'

—ধম্মপদঃ জরাবগ্‌গো।

আকাশে যদিও পদচিহ্ন থাকে না
নক্ষত্রেরা থাকে ;
যারা দূরে প্রসারিত হতে চায়
নিমগ্ন হতে চায় গভীরে শিকড়ে হয়তো বা
তাদের হাজার চোখে ডাকে।
বালিতে জলের রেখা থাকে না তথাপি
সমুদ্র অজর ; পাখিদের বিশুদ্ধ বিবেক।
আমরা কয়েকজন, নেশাখোর, ধবল হাওয়ায়
কমলারঙের রোদে অঘ্রানের ধূসর জ্যোৎস্নায়
নির্জনে শরীর মনে শুনিনি কি সময়ের স্বর
অন্ধকার দেখিনি অনেক ?

আমাদেরও হাড়ে এই বোধ আছে
এবং বিষাদ
মাঠের শিশিরে ঘাসে হিজলে বেতের ফলে ম্লান
অন্য কোনো পৃথিবীতে বাস করে জ্বর জ্বর স্বাদ।

আরেকটি মৃত্যু

জ্যোৎস্নার উন্মত্ত আতিশয্যে মুখ ঢেকে
যে মাটিকে আমি করতলরেখায় প্রত্যক্ষ করেছিলাম
আজ তা কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ে পাহাড়ে স্তম্ভিত, চারদিকে
গোপন গিরিকন্দরে কোন্ দুর্বোধ্য দেবতাত্মার মন্ত্রধ্বনি :
এসো, এই নাও জীবনের জল,
এই বিষ, এসো, এই নাও !

আর একবার নিজেকে হত্যা করবার আগে
অন্তঃসত্ত্ব চেতনায় উদ্ভাসিত হল :
কাক চিল চড়ুই ইত্যাদি পাখি
গরু ভেড়া কুকুর ইত্যাদি পশু
আম জাম কাঁঠাল ইত্যাদি বৃক্ষ ।
আকাশ আর মাটির ব্যবধান ঘুচল আমার দুই ডানার সেতুবন্ধে
আমার জান্তব যন্ত্রণায়
আমার শিকড়ে শিকড়ে, আমার ঊর্ধ্বগ্রীব শাখা-প্রশাখায় ।

মানুষের মুখ মনে পড়ল না
মানুষের মুখ মনে পড়ল না
কোনো মানুষের মুখ-ই মনে পড়ল না আমার !

প্রকাশ কর্মকারের একটি ছবি

আকাশে আবিল সূর্য । অকূল পাথারে
ভাসমান দৃষ্টিহীন নৃমুণ্ড পাঁচটি
কোন গূঢ় রহস্যের উন্মোচন প্রতীক্ষায়
তরঙ্গের অঙ্গাঙ্গি উদ্গ্রীব ।
প্রকাশ, তোমার ছবি দশ বছর আমার দেয়ালে ।

কেন চোখ উপড়ে নিয়েছ ওই লুব্ধ নরনারীদের ?
মানুষ সবাই বুঝি অন্ধ আবেগে ধাবমান ?
কিসের প্রতীক্ষা যদি সূর্য স্থির নীরক্ত নিস্তেজ ?
প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা বুঝি প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা শুধু
তটরেখা মায়াবী হরিণ ?

প্রকাশ, তোমার ছবি দশ বছর আমার দেয়ালে
দিন রাত্রি রাত্রি দিন তরঙ্গের অবিশ্রাম চলা ।
কোন মুগ্ধ নিয়তির বঙ্কিম ইঙ্গিতে শূন্যতায়
হে মাধব, রাত নামে, দিন চলে গেল ।

প্রস্তাবনা

বরদাকান্ত : পড়লে কি নতুন বইটা ?
সোমনাথ : নাম যার 'আজব গলিটা' ?
পড়লুম, হতাশ হলুম ।
বরদাকান্ত : নেই বলে আকাশকুসুম ?
সোমনাথ : জানতে চাও ? স্পষ্ট করে বলছি তা হলে !
তোমার লেখায় পচা ডিমের দুর্গন্ধ ।
যেমন হিজড়েরা তাদের অঙ্গ-অসঙ্গতির কারণে
কিম্ভূত হাততালি দিয়ে নাচে, ঢং করে
তেমনি করুণ তুমি । কিংবা তারও চেয়ে—
কেননা যখন
দাঁতের ফাঁকের ক্বাথ
বাথরুমের আবর্জনা ক্লেদ
অঙ্গের ভূষণ করে বাহাদুরি চাও
তোমাকে চিনতে পারে সকলেই ; তুমি
সেই সনাতন কর্পোরেশানের দাগি
বিলম্বিত বেতো ঘোড়া
শেষ রাতের বিষ্ঠার গাড়িকে
প্রায়ই আনো সকালের উজ্জ্বল আলোয় ।
তন্ময় : থামো, থামো । অশ্লীল, অশ্লীল ।
হে ঈশ্বর কানের দাওনি কেন খিল ?
বরদাকান্ত : তোমাদের উত্তেজনা এবং ঘৃণায় প্রশংসিত হলাম যথার্থ ।
নিজের অজ্ঞাতসারে জয়মাল্য দিয়েছ আমায়
নির্বোধ কাকের মতো তা দিয়েছ কোকিলের ডিমে ।
আমার অভীপ্সা ছিল ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের পুঁজ
তোমাদের সর্দিবোজা নাকের সাম্নে তুলে ধরা ।
মনে হচ্ছে, সার্থক হয়েছি ।
সোমনাথ : সার্থক হয়েছ বটে থুতু বিবমিষার উদ্রেকে ।
বরদাকান্ত : এবং স্বীকার করো, সত্য উদ্‌ঘাটনে ।
সোমনাথ : কোন সত্য ? কাকে তুমি সত্য বলে আখ্যা দিতে চাও ?
সে কি শুধু প্রত্যহের মলমূত্রত্যাগ,
পানাহার, মৈথুন এবং
রুজি-রোজগারের ঘৃণ্য প্রতিযোগিতার পরিশ্রম ?
তন্ময় : তা তো নয়, তা তো নয়
কখনও এ-সব সত্য নয় ।
সোমনাথ : এ-সব সত্য ঠিকই । কিন্তু এ তো সাহিত্য-কি কাব্য-সত্য নয় ।
মানুষের হৃদয়ের ঊর্ধ্ব-অভিসারের প্রয়াস,
মর্তসীমা ভাঙবার সাধ,

মানুষের চেতনার, মানুষের কল্পনার
বস্তু-অতিক্রান্তির ক্ষমতা
সেই চিরন্তন সত্য একমাত্র সত্য সাহিত্যের।

তন্ময় : ঠিক, ঠিক। আমারও তো তাই মনে হয়
হৃদয়ের গোপন গুহার ধ্যানে বসে
আমিও করেছি অনুভব। অনুক্ষণ।

বরদাকান্ত থাক, থাক। ভাবাবেগে ভেসে যাবে, সখা,
মালয়সাগরে কিংবা দারুচিনি দ্বীপে।
শেষে কি কুমিরে খাবে?
কাক-শকুনিতে ঠুকরোবে নাড়িভুঁড়ি?

সোমনাথ : তর্কে পরাজিত হলে বালিকারা দেয় সুড়সুড়ি,
চিমটি কাটে বটে নাবালক।

বরদাকান্ত জেগে জেগে যারা ঘুমিয়ে থাকে
তাদেরই তো চিমটি কাটে লোকে।
যে-সব মুখস্থ বুলি আউড়ে গেলে
যদিও তা কাজে লাগে ছাত্রশিক্ষকের,
সেগুলি খণ্ডিত সত্য, একান্তই বিকৃতভাষণ।
মূলকে অগ্রাহ্য করে ইচ্ছেমতো উদ্ধৃতি সাজানো।
হাত-পা উদরবুক চুল মাথা চোখকান নাক দাঁত
মূত্রদ্বার গুহ্যদ্বার নিয়ে
আমাদের বাইরের শরীর।
কেউ যদি মাথাটাকে নিয়ে, ধড়টাকে ফেলে দিয়ে, বলে
মানুষের খাঁটি বস্তুটিকে পেয়ে গেছি আহা,
সে করবে মিথ্যাচার ; কেননা সে
মৃত মানুষের অংশমাত্র পাবে।

তন্ময় : ভেঙে গেল হৃদয়ের বীণা।
গুলিয়ে যাচ্ছে মাথা। কী-যে সব বলছেন বুঝছি না।

বরদাকান্ত যেমন তোমার মাথা (ওর মধ্যে কী আছে তা ঈশ্বর জানেন)—
যেমন তোমার মাথা বলা যায়, পা এবং বুকেরই ঊর্ধ্ব-প্রসারণ
তেমনি সাহিত্য খোঁজে, বুঝলে হে, বস্তুকে আশ্রয় করে
বস্তুর উপরে দাঁড়িয়ে অতিক্রান্তির রসলোক।
নিছক সাহিত্যরস, তোমাদের কাব্যসত্য ইত্যাদি ইত্যাদি
একখানি ধড়হীন মাথা।

সোমনাথ : তেমনি অসত্য ফাঁকি শুধুমাত্র বস্তুর কঙ্কাল
জন্তুর নখর দাঁত কামকেন্দ্র
আর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ লোমকূপের ক্লান্ত বিবরণ
যেমন তোমার উপন্যাসে।

বরদাকান্ত শিল্পর ইন্ধন
অবশ্যত হওয়া চাই বাস্তবের দাহ্যপদার্থ।

আমি মনে করি এ-সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত
এবং ব্যাধির নির্মম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে
শুধুই যে রোগনির্ণয় হবে তা-ই নয়
পাব নিরাময়ের ইশারা, শিল্পীর ঈপ্সিত অতিক্রান্তির নির্দেশ।
সেরে যাবে সেরে যাবে বলে প্রার্থনা করলেই কিছু
সারবে না রোগ
অথবা রোগীকে ঘুমে-আধোঘুমে আচ্ছন্ন বা অজ্ঞ
রেখে চোখ ঠেরে রোগের কুশ্রীকে।
অর্থাৎ দাঁড়াতে হবে সত্যের আয়নার মুখোমুখি
সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে!

তন্ময় : ছি ছি, কী লজ্জার কথা।

সোমনাথ : তোমাকে বরদাকান্ত কী আর বলব। জানো না কোথায়
সাহিত্যের নিজস্ব সীমানা। তুমি সাহিত্যিক।
তোমার ঘাড়েতে নেই ব্যাধিনিবসনের গরজ
যদি না বনের মোষ তাড়াবার দায়
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করো। মনে হচ্ছে তুমি চাও শিল্পী সাহিত্যিক
একাধারে রাজবৈদ্য সমাজতাত্ত্বিক-দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সব কিছু
হবেন
যেহেতু অন্যথা তাঁকে, তোমাদের মতে, খণ্ড সত্যে বদ্ধ থাকতে
হবে।
ভাষান্তরে, কিছুই না জেনে কিংবা অল্পবিদ্যা নিয়ে সব কিছুর
তালগোল পাকিয়ে তাঁকে কিমাকার পরিবেশে কিম্ভূত মানুষ
সৃষ্টি করতে হবে ; না শিব না বাঁদর ; না কিছুই অর্থাৎ।
তাই বলি, মানুষকে সম্পূর্ণ জানার মাতব্বরি ছেড়ে
শিল্পীর নিজের ঘরে রূপে আর রসে তুষ্ট থাকো।

বরদাকান্ত : আমার বক্তব্য বলি ; খণ্ড খণ্ড সত্য নিয়ে বাঁচা
মঠে বা বীক্ষণাগারে সম্ভব হলেও
সাহিত্য-জীবনে অসম্ভব। উচিতের দৃষ্টি থেকে দেখি না কিছুই
নানা পক্ষপাত বিরুদ্ধতার ধাঁধায়
মানুষ কী করে, ভাবে, হয়ে ওঠে কিংবা হতে চায়
তাই নিয়ে আমার দোকানপাট। এ-জন্য ভীতিপ্রদ
পাণ্ডিত্য লাগে না, অজ্ঞতার ভয়ঙ্করী বিজ্ঞতাও নয়
ইন্দ্রিয় উন্মুক্ত রেখে কাঁচা জীবনের সঙ্গে
রক্তে মাংসে একাকার হয়ে যেতে হবে।
আমার লক্ষ্য তাই ভালমন্দ যুক্তিতে আবেগে তৈরি
পরিপূর্ণ জীবন্ত মানুষ। জন্ম পরিবেশ তথা
আর্থিক অবস্থা, ভাষা সংস্কার ঐতিহ্য ইত্যাদি
শারীরিক সামর্থ্য বা চ্যুতি, সৎ অসতেও বোধ, অধিগত ভাবধারা
সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে—

সোমনাথ আজব তরকারি এক। কিন্তু বন্ধুবর, ভাল করে ভেবে দ্যাখো
যাকে তুমি খণ্ডসত্য বলো তাই-ই চিরকাল
শিল্পীর আরাধ্য কি না। যেহেতু সাহিত্য
বিশেষকে রূপ দেয়, সামান্যকে চায় কোনো ব্যক্তির ভিতরে,
একটি নায়ক কিংবা নায়িকার আশা-হতাশায়
খোঁজে বহু হৃদয়ের দক্ষিণ কি উত্তরের হাওয়া,
খণ্ডিত হতেই হয় অবশ্যত তাকে।

বরদাকান্ত বিশেষ যে খণ্ডিত হবেই এ-কথা মানি না সোমনাথ
উল্টোটাই সত্য বলে জানি।
বিশেষ, আমার মতে, অখণ্ডিত সুস্পষ্ট সরল
কেননা তা ধরা-ছোঁয়া যায়। যা কিছু সামান্য
তা তো গুণহীন সংখ্যা শুধু, নির্বস্তুক কল্পনা কেবল।
আমার লক্ষ্য তাই সামান্যতা নয়, বিশেষের সমগ্রকে খোঁজা
আমার লক্ষ্য তাই জটিলে-সরলে গড়া জীবন্ত মানুষ
যে শুধু লেকের ধারে অপার্থিব প্রণয়গুঞ্জনে
অথবা ময়দানে রাগে গনগনে ঝাণ্ডার ছায়ায়
কিংবা কফিহাউসের নাবালক বাক্-আড়ম্বরে
সীমাবদ্ধ নয়; যে মানুষ হাসে কাঁদে, হাসায় কাঁদায়
রাগে মারে, মার খায়, ঈর্ষান্বিত হয়, ভালবাসে
ক্ষোভে ক্ষোভে বিরোধী আবেগে দ্বন্দ্বে
যে মানুষ একাধারে ক্ষুদ্র ও মহৎ, স্বাভাবিক।

সোমনাথ স্বাভাবিক? আজব গলির মানুষেরা?

বরদাকান্ত বাস্তবের মানুষেরা সত্যিই উদ্ভট, সোমনাথ,
যদি না তাদের গায়ের চামড়া ঢেকে রাখে
মনের মাধুরী আর কল্পনার রং।

সোমনাথ তোমার মতলব নিয়ে সাংবাদিক হওয়া যায় খাসা
কিন্তু ঘটনার যথাযথ বর্ণনাই শিল্পকার্য নয়।
চাই সংগঠন, চাই পরিণতির সুস্পষ্ট নির্দেশ।
এক-কথায়, লেখকের একান্ত আপন কল্পনার ছোঁয়া।
এবং কবজির দাগ।
তাই তো শিল্পীর কাজ অবিশ্রাম ঝাড়াই বাছাই
তাই তো শিল্পীকে দিক নিতে হয়।

বরদাকান্ত কোন দিক কার দিক? একদা শিল্পীরা
মানুষকে একান্তই নিয়তির দাস, হস্তরেখার পুতুল তথা
পূর্বকৃত পাপপুণ্য কর্মের ফলের ভোক্তা মনে করে
দুয়েকটি প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষিকে পটে এঁকে দেবতা বানিয়ে,
অবশিষ্ট মানুষের হাড়ে মাসে
ধর্মের বা ঈশ্বরের ডুগডুগি বাজিয়েছেন।
তখন আরেক দল শিল্পী এসে বলছেন, থামো হে

মানুষ আসলে পশু, জৈবধর্মে একান্তচালিত স্বার্থপর,
শিশ্নোদরপরায়ণ ;
মনুষ্যপ্রকৃতি জঙ্গলের নীতিনিয়ন্ত্রিত । এবং অধুনা
অনেক শিল্পী-কবি মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে
পেশাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন । অর্থাৎ
কৃষকশ্রমিকমহাজন যে যার নিজের শ্রেণী-স্বার্থে নির্ভুল
অঙ্কের ফলের মতো কাজ করে নাকি ;
নৌকো সোজাসুজি যায়, গজ কোনাকুনি চলে,
বাঁধাধরা ঘোড়ার আড়াই লাফ ।
কোন দিক, কার দিক নেবে ?

সোমনাথ : সে সমস্যা একান্তই তোমার নিজের ।
মূল সত্যে দৃষ্টিপাত করো । চেয়ে দ্যাখো
প্রকৃতি সুন্দর নয় কিংবা অসুন্দর
মনুষ্যজীবনও তাই-ই : নিরপেক্ষ নির্গুণ বাস্তব ।
কিন্তু সেই জড়বস্তু জীবন প্রকৃতি
অর্থময় হয়ে ওঠে, শিল্প হয়ে ওঠে
এবং সুন্দর
নিপুণ শিল্পীর স্পর্শে । শিল্পীকে অবশ্য তাই দিক নিতে হবে ।

বরদাকান্ত : সব ভুল । সব দিকই ভুল যদি জীবনের জটিল দ্বন্দ্বকে
রূপ দিতে চাও । শিল্পকৌশলের জন্য যেটুকু দরকার
সেটুকু বর্জন করে আর সবই মেনে নিতে হবে ।
যারা দিক নেয় তারা সত্যভ্রষ্ট সঙ্কীর্ণ দলীয় ।

সোমনাথ : তা হলে, বরদাকান্ত, তোমার বিচারে
ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয় ।
প্রতিপন্ন হয় এই, সব সড়কই কানাগলি আর
পথভ্রান্ত কানামাছি পূর্বগামী শিল্পীরা সব্বাই ।

বরদাকান্ত : অন্তত এ কথা জানি অসম্পূর্ণ তাঁদের রচনা ।
এবং জেনেছি বলেই অনুভব করেছি নিজের
লেখার অপরিহার্য প্রয়োজন এবং তাগিদ ।
তা না হলে, লেখার পিছনে আর কী-বা যুক্তি থাকে ।
আঙুলের উত্তেজনা কিংবা আজীবন
বয়ঃসন্ধির মিঠে কান্নাকেই জিইয়ে রেখে
মাথা গুঁজে পূর্বগামীদের মক্‌শো করা ছাড়া ?

সোমনাথ : আমার তো মনে হয় তোমার ভাষণ
শূন্যগর্ভ আত্মম্ভরিতা, ঐতিহ্যের অস্বীকৃতি
বিদ্বেষী হীনতাবোধে অগ্রগামীদের প্রতি ব্যর্থ অপমান ।

বরদাকান্ত : তোমার ও অনুমান দূরভ্রান্ত, সোমনাথ । শিল্পের বিচারে
অন্যতম বাটখারা হল সৃষ্টি আর স্ফূর্তির স্থান কাল ।
পূর্বগামী মেধাবীরা অনেকেই সুসম্পূর্ণ নিজেদের যুগের প্রেক্ষিতে

বন্যেরা যেমন বনে, এবং সার্থক তথা স্মরণীয়।
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্যাও নবতর জটিলতা
আর
তদুদ্ভূত অচেনা আবেগে
নতুন স্রষ্টার মুখাপেক্ষী হয়, খোঁজে
সেই পুরাতন মানুষেরই ভিন্নতর উপস্থাপন, অর্থ।

সোমনাথ : তবে কি তোমার মতে চিরন্তন মূল্য কিছু নেই ?
প্রাচীন সাহিত্য শুধু গত দশকের হলদে খবর কাগজ ?
ছাত্র-শিক্ষকের পাঠ্য, কুঁজো গবেষকের কাঁচামাল ?

বরদাকান্ত : আমার বক্তব্য থেকে ও সিদ্ধান্ত কখনও আসে না।
সাহিত্যের সারাৎসার মনে করি একটি অম্লান আলো তাপ—
এই তাপ, এই আলো যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জ্বালানি দিয়েছে
কখনও খড়কুটো কাঠ, কখনও বা কয়লা বিদ্যুৎ।
জ্বালানিটা যুগের যোগ্য হওয়া শুধু বাঞ্ছনীয় নয়,
একান্ত অপরিহার্য।

তন্ময় : আলস্যের চেয়ে কিছু ভাল নেই
আলস্যের পথ সীমাহীন,
আড় হয়ে শুয়ে আছি চিন্তার উপরে।
নরম ভাবনা যত এলোমেলো দক্ষিণের হাওয়া
সবচেয়ে অসম্ভব নভেলের নায়িকাকে
হাজির করেছে এই
দুই ক্রোশ, তিন ক্রোশ, চার ক্রোশ
দীর্ঘ অন্ধকারে !!

সংযোজনা-২

সূচিপত্র

যিশুখ্রিস্ট

লৌহ্ শিকলে বন্দি মানুষ
    বারুদ-বোমার ঘরে ;
দূষিত ধোঁয়ায় তোমারে কি যায় চেনা ?

মরণ-মাতাল দানব গরজে
    শান্ত নীলাম্বরে
তব বাণী হায় কেহ্ আজ শুনিবে না !

মানবাত্মার এ মহাশ্মশানে,
    কোলাহল হাহাকারে
তুমি এসো ক্ষমা-প্রেমের নিশান-ধারী ।

নিপীড়িত নর তোমায়, তাপস,
    খুঁজিতেছে চারিধারে,
প্রেমের আগুনে গলাইয়া দাও নির্মম তরবারি !

একদা

সোনালি রঙের শাড়ি ছিল দেহে
    ঝরা-বকুলের সৌরভ কেশে,
একদা তোমায় লেগেছিল ভাল
    গোধূলি-ধূসর দিনের শেষে !
সাদা কালো লাল হলদে সবুজ
    নীল ভায়োলেট ব্রাউন আর
আছে যত রং—হতে পারে যত—
    (পারিব না দিতে তালিকা তার)
চেনা ও অচেনা, স্বদেশি বিদেশি,
    বিবিধ রঙের নানা ভেজাল,
নানা আকারের নানা প্রজাপতি
    জ্বেলেছিল রূপ-রংমশাল ।
দখিনা কিংবা পূরবি পবন
    (মনে নাই ঠিক কোনটি হবে)
সেদিন তোমার খোঁপা খুলে কানে
    কী-যে কয়েছিল বংশীরবে !
তোমার সখীর গোপন সে-কথা
    বুঝতে যদিও পারিনি আমি,

মধু-রসময় সংগীত তার
কোনো দিনও কানে যাবে না থামি ।
সহসা আকাশে হাজারো শঙ্খ
বেজে উঠেছিল ঐকতানে
সেদিন আদিম-আতঙ্ক মোর
হিয়া মাঝে ভীরু কাঁপন আনে !
তারপর হায় আঁধারের কোলে
কোথা যে পলালে কিছু না বুঝি ।
সখী সমীরণ কাঁদে গুমরিয়া
বৃথা চারিদিকে তোমারে খুঁজি ।

আমার মেসের নীচে

আমার মেসের নীচে শস্তা ধেনো মদের দোকান ।
উন্মাদ উল্লাস সেথা চলে রোজ সারা রাত্রি ধরি ।
চেঁচামেচি, গালাগালি, অশ্রাব্য অশ্লীল যত গান,
পৈশাচিক হাস্যস্রোতে বিষাইয়া ওঠে বিভাবরী ।

আমার মেসের নীচে পরম পবিত্র দেবালয় ।
রোজ রাতে জোটে সেথা অপার্থিব আনন্দ কাঙাল
শাণিত বাস্তব ক্ষুরে ছিন্নমনা রক্তাক্ত মাতাল,
পৃথিবী যাদের কাছে পুঞ্জীভূত দুঃখভারময় ।

আমার মেসের নীচে ঘৃণ্য সেই মদের দোকান ।
রোজ রাতে ভাবি কল্য কর্তৃপক্ষে জানাব নালিশ ।
তাদের তরেতে তবু ভোরবেলা কেঁদে ওঠে প্রাণ
আমরা অমৃত নিয়ে যাদের দিতেছি শুধু বিষ ।

আমার মেসের নীচে বোতল-সে প্রেমে ভরপূর ।
নিরানন্দ অন্ধকারে মৃদুভাতি আশার মশাল ।
আলেয়া সে জানি—তবু আলো তারা পায় ক্ষণকাল
আশার আসর থেকে যাহাদের নাম না-মঞ্জুর ।

মেঘ

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক বিরাট আকাশের বৈকালী মেঘকে
বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরার বাসনা হয়েছিল,
আর কোনো এক মরচে পড়া মন
সেই কথা শুনে খুব একচোট হেসে নিয়েছিল।
আজকাল আর সে-রকম ইচ্ছে হয় না
মেঘেরা তো হামেশাই যাতায়াত করে
রংবেরঙের বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে
গোরস্থানের মাথায় আর শ্মশানের উপরে।
আজকের আকাশের মেঘ অস্বাভাবিক
যেন ছবি অতিরঞ্জিত
কিন্তু আমার মন যে ভিড়াক্রান্ত
ভারাক্রান্ত আমার মন।
হাসুক নাচুক মেঘেরা। সময় নেই
আকাশ পর্যবেক্ষণ করবার।
দুর্দিন, দারুণ দুর্দিন।
শোভা পায় না ও-সব মনিহারি কারবার।
স্বপ্নকে শাসন করছে বীভৎস বাস্তব
হাড়বেরকরা, চোখ নিরুত্তেজ।
(সত্যি কি ইউরোপের এক রাজনৈতিক বৈঠকে
তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের দলিল দস্তাবেজ ?)
মেঘেরা নাচুক, কাঁদুক, করুক যা ইচ্ছে তাই
আমাদের সংগ্রাম সময়ের প্রতিটি ইঞ্চিকে নিয়ে,
যার শেষে জয়ী হবেই দুর্বার জীবন। তারপর
দেখা যাবে মেঘ, রোদ আর বৃষ্টি, শেয়াল-শেয়ালির বিয়ে।

দিনলিপি থেকে

১

এখন সে স্নানাগারে উদ্ভিন্নযৌবনা
কোনো এক নারীর মতন।
নিজের শরীর নিয়ে এখন সে একেবারে একা
আর তার মন।
যেতে পারে যেখানে সে যেতে চায়
পেতে পারে যা খুশি সে পেতে চায়
নিজের নিশ্বাসে তার জাগে শিহরন।

এখন সে সবকিছু জানে
পৃথিবীর জীবনের মানে
এখন সে একেবারে একা
আর তার মন।

২

কল্পনা অসহ্য লাগে
কল্পনা অসহ্য লাগে
কল্পনা অসহ্য লাগে আজ—
তোমার নরম চুল
তোমার রেশমি চুল
তুলোর মতন তারা সাদা হয়ে যাবে
তোমার শরীর হতে রহস্য ফুরাবে।

৩

একটা নিমের দাঁতনের তুলিতে
তিনকড়ি মিস্তির পোস্টার লিখছে।
তিনকোনা ঘরেতে তিনটে খাটিয়া
তিনটে তিনপায়া টেবিল নড়ছে

মাঝরাতে ঝোড়ো হাওয়া উদ্দাম নৃত্যে
তির্যক পৃথিবীকে তুলোধোনা ধুনছে।
বাতের মলম পাঁজি খোলনোড়া ধুনুচি
ত্রিপ্রহর গুনছে।

৪

লড়াই খতম টলমল করে চাকুরি
শীর্ণ উদর বীভৎস দিন আসছে।
পালাব কোথায় স্বপ্নেও দেয় হানা
দুঃস্বপ্নের বর্বর বর্গিরা।

নেতারা নীরব নিমগ্ন কাশ্মিরে
বাঁচবার পথ স্বীয় শক্তিতে আস্থা।
পুরনো বোতলে নতুন মদ কি ধরে—
জনতা গড়বে জনতার পাকা রাস্তা।

৫

উপাত্ত নির্ভুল তবু বারবার সিদ্ধান্ত বিফল।
ক্রমেই জটিলতর জীবনের অস্তিত্বপঞ্চক
সমীহার শেষে যদি অজ্ঞাত সে রাশি প্রবঞ্চক
ধরা পড়ে ঘর্মস্নানে তুষ্ট হবে প্রাণ কপিঞ্জল!

৬

রাত্রির আঁধারে দেখি স্তব্ধতার অঙ্কলীন কোনো
নিস্তেজ মুহূর্ত এক ক্লান্তরতি মেয়ের মতন
ঘুমায় ঘুমায় যেন এ-পৃথিবী সবুজ কোমল।

আমার কামনা তার বাসনার লালসা ছাড়িয়ে
ঝরা পাতা খুঁজে মরে বাবলা ও অশোকের বনে
যেখানে গেরুয়া নদী আর এক হাঘরে কুকুর
পরস্পর শুয়ে আছে গলাগলি অভিন্ন হৃদয়।

হরিণে বাছুরে প্রেমে মৌতাতে মাতোয়ারা হয়ে
কারণে গরম ছিল আমাদের পূর্বপুরুষেরা
আহা সে তোয়াজে তোফা পতঞ্জলি কৈবল্য পেয়েছে।

আমরা চার্বাকি তবু মায়াবাদী হয়ে বেঁচে আছি
ভাঁড়ার লোপাট, হাটে লোক নেই, ঘাটে
স্নান করে একজোড়া বিমর্ষ বলদ।

হে হৃদয়, কত দ্বীপ দীপের মতন জ্বেলে রাখো
পৃথিবীর নীল নীল সীমাহীন সাগরের জলে।
যদিচ ধূসরাকাশ কোনোদিন ঘন আঁধিয়ারে
আপন বয়স ভুলে নাচবে না নটীর মতন।

অর্ধনারীশ্বর

দাও আগুনে তবে জ্বালিয়ে দাও
যত দূরের স্মৃতি মলিন ছবি।
দিনাবসানে যদি শান্তি চাও
কিছু চেয়ো না, কিছু চেয়ো না, কবি।

আছে আলো তোমারই চোখের নীলে
খোঁজো আঁধারে পাবে নিজেকে ফের,
যাকে পেয়েও তুমি হারিয়েছিলে
দুর্দৈবে সেই ঘুর পথের ।

তার প্রাপ্য তাকে দেবে না কেন
কেন দেবে না তাকে এগিয়ে ঠোঁট ?
দ্যাখো উন্মাদিনী কুন্দ হেন
তার পাপড়িগুলি বেঁধেছে জোট ।

তার মনের মাঝে গভীর ক্ষত
তাই সাধের চুল এলিয়ে গেছে ;
নেই কপালে টিপ আগের মতো
বুঝি মন্দজনে গাল দিয়েছে ।

আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে
কিছু চেয়ো না, কিছু চেয়ো না, কবি ।
মনোমুকুর নিয়ে দাঁড়াও দোঁহে
পাবে হারিয়ে ফেলে যা কিছু সবই ।

মৃত্যুর আগে

কোন্ মৃগনাভি খুঁজেছি আত্মঘাতী
অবচেতনার বৃক্ষবিরল পথে ?
কক্ষান্তরে ধর্ষিতা উর্বশী
হা হা করে হাসি নিজের সর্বনাশে ।

কঠিন দেয়ালে নখ দিয়ে লিখে রাখি :
এ-জীবন শুধু যন্ত্রণা শুধু যন্ত্রণা,
তবু এসো এই ক্ষুরধার পথে ব্যর্থতায়
নীল বিষে পাবে বেদনার প্রেম স্পর্শ ।

হলুদ বেগুনি টকটকে লাল আঘাতের
রং মাখো রং মৃত্তিকাময়ী চেতনায়
বেদনার ফুলে হয়তো সুফল পাবে
হোক না অলীক লোকবিখ্যাত বৃক্ষ ।

ভালবাসি

মানুষ এখনও মাটির পুতুল কেনে
রথের মেলায় বাঁশি,
জানালায়, দোরে গভীর পর্দা টেনে
হেসো না অবিশ্বাসীর বিজ্ঞ হাসি ।

স্নিগ্ধ আলোক রয়েছে শিশুর চোখে
আশা প্রেমিকের মনে ।
শ্রাবণদিনের আর্দ্রতা কারও শোকে
স্বপ্ন আবেশ অনেকের জাগরণে ।

ছোটখাটো সুখ ব্যর্থতা চেষ্টায়
হাজার জীবন চলে
সমুদ্রে নয়, দূর নির্জন উপত্যকায় ;
একা একা কথা বলে ।

সেই কথাগুলি পুতুল বানায়, বাঁশি
বাজায় উদাস সুরে ।
সব সত্ত্বেও জীবনকে ভালবাসি
বলে শুধু ঘুরে ঘুরে ।

অন্ধ

আমি কি বিকেলের প্রণয়ী ছিলুম না
কিংবা সকালের পিতল রৌদ্রের ?
হৃদয়, বলো তুমি, তুমি তো জানো সবই,
আমার প্রেম ছিল সত্য ।

তীব্র জ্বরে ঘোর বেহুঁশ উচাটন
যন্ত্রণায় নীল ঢেউয়ে উত্তাল
থেমেছি জানালায় লোহার ফ্রেমে-আঁট
প্রতীক্ষায় স্থির চিত্র ।

অন্ধকার ঘরে দেয়ালে আলোকের
প্রথম স্পর্শের কান্না থরোথরো
সারাটা দিনমান ভ্রমর গুঞ্জন,
বিকেল বিস্ময় মুগ্ধ ।

দুপুর তবে বুঝি সুদূর আন্‌-বধূ
আঁধারে কেন মুখ লুকিয়ে রাখি ?
হৃদয়, বলো তুমি, তুমি তো জানো সবই
আমার প্রেম আজ অন্ধ ।

কান্না

কাঁদিনি । বুকের মধ্যে অনেকটা হাওয়া প্রাণপণ
চেষ্টা করছিল বটে ভেঙে ফেলবে দরজার আগল ।
সমস্ত পৌরুষ নিয়ে আগুনের সামনে দাঁড়িয়েছি ।
দেখেছি কেমন করে পুড়ে যাচ্ছে রক্ত, মাংস, হাড় ।
এবং স্মৃতির পাতা, ছোট গল্প, কবিতার কলি ।

ফিরিনি, যেমন করে ফিরে আসে পরাজিত ঢেউ ।
মনে হয়নি অর্থহীন মেয়েটির চপল চাউনি
প্ল্যাস্টিকের খেলনা নিয়ে ছেলেটির একগাল উল্লাস
এই লাল এই সবুজে বিজ্ঞাপনে অক্লান্ত আলোক
মনে হয়নি অর্থহীন হাততোলা ট্র্যাফিক পুলিশকে ।

মনে হয়েছিল শুধু ও-সবের আমি কেউ নই ।
এমনকি দর্শকও নই, দেখছি শুধু দৃষ্টি আছে বলে ।
বাড়ি ফিরে আমি আজ আকাশকে সঙ্গিনী করব
কেউ জানবে না একা ডুব দেব গভীর অতলে ।
তারায় তারায় নীল হাহাকারে লীন হয়ে যাব ।

এসো শব্দ

স্বপ্নে নয়, শিরায় শোণিতে
এসো তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ;
এসো অন্ধ সঙ্কীর্ণ গলিতে
ক্ষুব্ধ বড়োরাস্তার সংবাদ ।

সৈনিকেরা যেখানে নিহত
আনন্দিত চিত্তে ঊর্ধ্বমুখ ;
বিপরীত সহবাসে রত
বাঘিনীর প্রণয়ে উন্মুক ।

আর নয় স্বপ্নের গলিতে
এসো জন্ম, মৃত্যু, উচাটন ;
এসো শব্দ শিরায় শোণিতে
এসো নগ্ন স্পষ্ট উচ্চারণ ।

জার্নাল থেকে

বিকেলেই হয়ত আসবে । আসবে কি ?
সমস্ত দুপুর ধরে
রবীন্দ্রনাথের গান
গুনগুন করেছি :
ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন ? সে কি
এখনও তেমনি আছে ?
সে কি আছে ? সে কি আছে ?
হায় নারী, ফুল নেই হেমন্তের গাছে ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে কচ্ছপের আকৃতি নিয়েছি ।

একটি পুরনো চিঠির অংশ

তুমি যখন আমায় ভালবাসতে—উজ্জ্বল নীল আকাশের রঙ ছুটির দুপুরে দিঘির শরীরে আলস্যের আলোছায়া বিস্তার করত । কোথাও কোনও উত্তেজনা ছিল না ; কেবল ঝরা পাতার স্পর্শে মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠত ছোট ছোট আবর্ত আর তারই অনুরণনে সময়সমুদ্রের শেষ প্রান্তরেখায় পৌঁছে আমরা দুজন আদিম নরনারী প্রথম সঙ্গমকালের বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, মনে পড়ে ? তুমি যখন আমায় ভালবাসতে ।

চারিদিকে ঝরা পাতার শব্দে ব্যাধবিতাড়িত হরিণের পদধ্বনি ; আমাদের হৃদয়ে আজ আর কোনও দিঘি নেই । এসো, এসো । হৃদয়ের বন্ধুর প্রান্তরে আমরা এক পাণ্ডুর চাঁদকে ডেকে আনি । হাজার হাজার বছরের মানুষের বহুবিচিত্র চিন্তা কোটি কোটি নিস্পন্দ শব্দে পুঁথিতে পুঁথিতে ঘুমিয়ে রয়েছে । থাক । জেগে উঠেই তারা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধাবে । আমাদের স্তিমিত রক্ত আর এক পাণ্ডুর চাঁদ অন্য এক প্রত্যক্ষ সত্যকে জন্ম দিক : পশুদের প্রেম কেবল বিশেষ ঋতুর উত্তেজনা আর মানুষের কাছে সব কালই ভালবাসার বর্তমান । এসো ।

সাদা দেয়াল

দেয়াল, সাদা দেয়াল, ভাল লাগে না !
কোথায় আমার আপন অন্ধকার, কানা গলির ঘর।
ভাঙা তক্তাপোশ, চটাওঠা কলাইয়ের বাটি,
এলোমেলো চিঠির পালক, ছেঁড়ামলাট কবিতার বই
আর ধ্বসা দেয়ালের সেই আবছা মুখরেখা—
আমার রহস্যময়ী, আমার স্বপ্ন, আমার যৌবনসঙ্গিনী।
দেয়াল, এ-সাদা দেয়াল, ভাল লাগে না।

চেয়ে থাকি ঠাসা বাক্সের দিকে
এই আমার নতুন ঘর শৌখিন পর্দায় ঘেরা।
পরিপাটি বাঁধানো দাঁত
আমাকেও বসতে দেয়, থাকতে বলে না।
চা খাই, সতর্ক থাকি, বেতারে বাজারদর শুনি
আর মনে পড়ে কানা গলির মেদুর অন্ধকার
পাশের বাড়ির মেয়েটি গান গাইত—,
কিন্তু সে-কথা থাক
সামনে দেয়াল. চর্তুমুখ দণ্ডধারী ঈশ্বর।
ভাল লাগে না।

খিদিরপুরে

চোখে তার শ্রাবণতা ছিল ;
অতএব গভীর জঙ্গল
কালো চুলে ; নানাবিধ পাখি
গান গায়, গান গায়, গান।

সারা দিনমান ট্রামে-বাসে :
চারদিকে বেপরোয়া ঘাস,
ছাগল, মাংসের চপ, কৃমি
দেখি মত্ত স্বভাবী হিংসায়।

তার চোখে ভীত পাখিদের
সুস্বাদু আহার মনে করি।
হয়ত বা এমনই বিপাকে
কবিতা, কথার মৃত্যু হয়।

তবুও খিদিরপুরে গিয়ে
জাহাজের বিজাতীয় ঢঙে
আমার তাপিত পাকস্থলী
গান গায়, গান গায়, গান।

কামারাদেরি

এখন মনে হয় তোমারই ভুল ;
হায় রে, কৃষিকাজ জানো না মন ;
চাইলে পেতে তাকে তবুও তুমি
করেছ ঈর্ষার বীজবপন।

ফলেছে হিংসের হলদে গাছে
লালসা লকলক সাপের ফোঁস ;
কেন রে সোজা পথে গেলি না তুই,
ব্যর্থ হল তোর অণ্ডকোষ।

পেলি না পুত্রের কৃপার স্বাদ ;
মানবজন্মের নগ্‌দা দাম ;
কেন রে সোজা পথে গেলি না তুই,
এখন কালি হল তোর সুনাম।

ছি-ছি কি তাই বলে বেলুড় মঠ
ছুটবে মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরি ?
আছে তো পুন্নাম নরকে ঢের,
বন্ধ্যা নারী হবে কামারাদেরি।

পাখি, নারী

অরণ্যলাবণ্য তুমি এনে দিলে পাখি,
আসন্ন সন্ধ্যায় অন্য সূর্যের বিস্ময় !
তখনও অনেক ধুলো, পথ ছিল বাকি,
বর্তমান ক্লান্ত ছিল, ভবিষ্যৎ ভয়।

ভুলেছ কি হে আকাশ, প্রশান্ত সুনীল,
সেদিন তোমার মনে সে কী আড়ম্বর,
আর আমি ভ্রষ্টনীড়, খুঁজি অন্ধ চিল
জীবন যন্ত্রণা জেনে মৃত্যুর গহ্বর।

জানো না কি হে বাতাস, স্নিগ্ধগন্ধবহ,
সেদিন তুমিও ছিলে নিষ্ঠুর উন্মাদ,
প্রায়মগ্ন তরী আমি ডুবি অহরহ
চৈতন্য যে-স্রোতাবর্তে লবণাম্বু স্বাদ ।

সেখানে, সে-শূন্যতায়, এনে দিলে পাখি
সোনালি খড়ের রং, ফসলের ঘ্রাণ
হে প্রেয়সী, মূর্ত প্রেম, ওগো যুগ্ম-আঁখি
প্রসন্ন এ-প্রাতঃকাল তোমারই নির্মাণ ।

অস্পষ্ট

তোমার মুখ আর স্পষ্ট মনে নেই
অনেক পথ দূরে এসেছি ফেলে ।
বাতাস নির্দয়, আকাশ আলোহীন
বসেছি চারদিকে আগুন জ্বেলে ।

শুকনো কাঠকুটো করেছি জড়ো সব
আমারই নৌকার পাঁজরা হাড় ।
সাগরে বড় ঢেউ, কেবলই ভয় বাধা
কুমির তিমি সাপ হাঙর আর ।

এবং সাগরের পাখিরা কুৎসিত
ডানায় বিষবায়ু, দৃষ্টিহীন ।
তোমার মুখ আর স্পষ্ট মনে নেই
সবুজ দ্বীপ, হায়, সুদূর দিন !

গাংচিল

'হাজার শহর আছে পৃথিবীতে
সাবধান ।
হাজার হাত আছে পৃথিবীতে,
পুরোপুরি হাজার শহর,'
হুঁশিয়ার করে দিল মর্মরনির্মিত এক
উদ্যান-বালক ।
'এবং যন্ত্রণা যাকে কেউ না করুণা করে থাকে
এবং নিঃসঙ্গ যত জাদুকর আছে সেইখানে,
এবং মানবকণ্ঠ পাখি আছে,

এবং প্রেমিক যত ক্লান্তরুগ্ন হয়ে গেছে প্রেমে,
এবং গাংচিল সেই গাংচিল
সেই গাংচিল তীব্র হিংস্র উন্মাদ।'

(পিটার ভাইরেকের অনুসরণে)

তামসীর জন্য

পারতুম যদি পারতুম আমি তোমাকে দিতুম, তামসী,
অপরাজিতার নীলাভ শাদায় একটি ভোরের স্বপ্ন।
শুধু ইচ্ছায় ফোটে না তো ফুল, আসে না তো ভোর, তামসী,
তাই নিয়ে যাও, এই নিয়ে যাও, অন্ধ রজনীগন্ধা।

রাতের কান্না রজনীগন্ধা তাই নিয়ে যাও, তামসী,
আমি যে ক্লান্ত, আমি পারব না, সূর্যকে ছিঁড়ে আনতে।
কান্নার হ্রদে স্নান করে পরো লজ্জা আমার, তামসী,
আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব অতীত কামনার মরা জ্যোৎস্নায়।

যে-সব কবিতা আমি

যে-সব কবিতা আমি ভালবেসেছিলুম যৌবনে
আজ তারা স্মৃতির যন্ত্রণা :
ধূসর নগরী, নারী, পরিত্যক্ত উদ্যান প্রাসাদ—
যে-সব কবিতা আমি ভালবেসেছিলুম যৌবনে।

যুবকের কথা শুনি, আড়ি পেতে শুনি যুবতীর।
না, কেউ বলে না তার কথা সেই মৃত নগরীর।
মলিন মর্মর মূর্তি, ম্লান চাঁদ, আমি শুধু একা
একটি উৎসুক পথ আর আমার গভীর অসুখ :
যে-সব কবিতা আমি ভালবেসেছিলুম যৌবনে।

বিচ্ছিন্ন চিন্তা

১

কবিকিশোর, কোন খেলাতে
জামাটা তোর ছিঁড়ে গেল,
রঙিন জামা ?

নিষ্ঠুর সেই খেলার নায়ক ।
তাকে কী করে প্রেমিক বলি
যেমন বলে অনেক লোকে
ফাগুন মাসে, চৈত্র মাসে ।
সামনে আমার দশ বছরের
প্রতিকৃতি ।

২

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে ঘাসের কী সম্পর্ক ?
তোমার সঙ্গে আমার ?
শুয়ে থাকি ঘাসের উপর
দেখি অনেক দূরের সন্ধ্যাতারা
আমি তোমার তুমি আমার ।

৩

আনন্দের দিন নয় জন্মদিন ।
মন্থর গরুর গাড়ি জানালার কাঁচে ।
কারা কারা বেঁচে আছে
কিম্বা শুধু আছে ।
কে তুমি কোথায় তুমি
কেউ নেই সামনে পিছনে ।
শীতের বৃষ্টির ছাঁটে শিউরে ওঠা
আনন্দের দিন নয় জন্মদিন ।

৪

যা যা । যা হয়েছে যথেষ্ট ।
যা করেছিস তা করিয়েছেন তিনি ।
বল মন, বল জয় রাধেকেষ্ট ।
যা করেছিস, তা করিয়েছেন তিনি ।

সিঁড়ি

কেন তুমি শৈশবের মত স্পষ্ট হলে না
হে আমার সত্য, বন্ধু আমার ।
ঠাকুমার স্তনের মতো ঠাণ্ডা ঘর
উপরে পেতলের ঝুলন্ত ঘণ্টা
সামনে স্নিগ্ধগন্ধ আয়তচোখ রাধাকৃষ্ণ
কেন তুমি তেমন স্পষ্ট হলে না ।

লোহার সিঁড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
বীণাদি যেদিন মারা গেল সেদিনকার মতো
একটুকরো বীভৎস রুগ্ন আকাশ।
এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে
সত্য, বন্ধু আমার, এই-ই কি তোমার মনে ছিল!

টলমল করে কাঁপছে আমার পা
নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরছে।
আমার হাত ধরো, আমায় নীচে নামতে দাও
যেখানে ঠাকুমার স্তনের মতো ঠাণ্ডা ঘর
পেতলের ঝুলন্ত ঘণ্টা
সামনে আয়তচোখ রাধাকৃষ্ণ।

দারজিলিং-এ

অপূর্ণ থাকেই কিছু গুপ্ত সাধ।
থাকে বলে দিনযাপন সহনীয় হয়,
অপেক্ষায় স্বপ্নের অকালবৃষ্টি ঝরে।
এ-অস্থায়ী ঠিকানায়
আর মাত্র তিনদিন বাকি।
বেলা যায়
মেঘে মেঘে অন্ধকার
অস্পষ্ট পাহাড়তলি
কুয়াশায় আরও কুয়াশায়।

গোলাপ ফুটবি কবে
গোলাপ ফুটবি কবে বল?

২

সোনালি অর্কিড, আমি
একঘণ্টা তাকিয়ে রয়েছি
দেখে দেখে আশ আর মেটে না।
তুমি যেন রাজকন্যা কাচের জানলায়
আর আমি রাখাল বালক
কাঙাল চোখদুটি ছাড়া
যার আর কিছু নেই,
এমনকি, বাঁশের বাঁশিও।

দুঃখ

একবোঝা দুঃখ নিয়ে
একলাটি চলেছ কোনখানে ?
কোথায় নামাবে দুঃখ ?
কার দোরে ?
কেউ কেউ আছে যারা
শোনা যায়
নিজের দুঃখ ভুলতে
দুঃখ কেনে ।
এ-দেশে তেমন ক্রেতা
আছে কেউ ?
এ-দেশে যারাই দুঃখী
দেখা যায়
বড় দুঃখী তারা ।
আর যারা দুঃখী নয়
শুয়ে থাকে বালিশ জড়িয়ে ।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি রাত

মাতাল হয়ে শুয়েছিলুম ঘাসের ওপর
হাড়কাঁপানো শীতের রাতে ।
সারাটা রাত বুকের মধ্যে হাড়ের মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে
মোচড় দিয়ে গেল
নিখিল বাঁড়ুজ্জে ।

শব্দ শুধু শব্দ সেই শব্দ যেটা
রক্ত এবং শিরায় শিরায় গুমরে গুমরে
জানায় আমি একলা ভীষণ একলা একা
অনেক দূরের বহু যুগের কোন জন্মের
কান্না আটখানা হয়ে ছড়িয়ে গেল ভিতর দিকে
বুকের মধ্যে হাড়ের মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে
আমি এবং
আমার কান্না তোমার আঙুল
নিখিল বাঁড়ুজ্জে ।

সৃষ্টি

কেউ দেয় না। বানিয়ে নিতে হয়
মনের মতো নারী।
জলের ধারে গিয়ে বলেছি দাও
গাছের কাছে গিয়ে বলেছি দাও
আকাশে মুখ তুলে বলেছি দাও
কেউ দেয়নি।

বিয়েবাড়িতে ঝিমিয়ে পড়া রাত
কত যুগ-যে বাড়িয়ে ছিলুম হাত
আঙুলগুলো অসাড়, রক্তহীন
কাঁপা শরীর বেয়ে ঝরেছে হিম
আর কবে বা ? দাও এবারে দাও
কেউ দেয়নি।

কেউ দেয় না। বানিয়ে নিতে হয়
মালমশলা তা-ও।
হাত বাড়ালে সব কিছু উধাও।
তুমি আছ এবং ইচ্ছে আছে
সংগোপনে যা-ইচ্ছে বানাও।

সবার আগে মনের মতো নারী।

হেমন্তের প্রার্থনা

শৈশবে দুলেছি কত
মর্মরিত তোমার ছায়ায়।
পাখি ছিল, কত পাখি ছিল !

কৈশোরে তোমার বাহু
আলিঙ্গনে বেঁধেছে নিবিড়।
সাথী ছিল, কত সাথী ছিল !

যৌবনে তোমার মূলে
ফুলখেলা করেছি রঙিন।
গান ছিল, কত গান ছিল !

আজ কিছু ফল দাও
হে বৃক্ষ, হে কল্পতরু !
পাখি নেই, সাথী নেই, গান নেই
প্রৌঢ় আমি-যে ।

৩১শে ডিসেম্বর,

বছরের শেষ রাত্রি মত্ততায় অন্ধ হয়ে গেলে
প্রবাসী বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা জানালুম :
তাদের গৃহপ্রত্যাগমন ত্বরান্বিত হোক ।

এখানে এই পাঁচতারার হোটেল,
কী স্পর্ধা,
সমুদ্রকে বারংবার ভেংচি কাটছে ।
আমার চারদিকে অতিবিত্ত মানুষের বিশাল শূন্যতা,
আমার চিকেন-কাবাবে বিশুদ্ধ নারকোল তেলের গন্ধ ।

আসার পথে শ্রীকাকুলামের গ্রামে
তালগাছের ছায়ায় আখের বোঝা মাথায় নিয়ে
যে-মেয়েটি হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল,
তার কথা মনে রেখে
অথবা এই মুহূর্তে আমার মগজে
তিরিশ দশকের কয়েকজন বাঙালি কবি
টগবগ করে সিদ্ধ হচ্ছিলেন বলে
আচমকা তার হাত ধরে বললুম :
থামো, রাত শেষ হয়ে এল,
ঘরে যাবে না ?
অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি থামিয়ে
ক্যাবারের উলঙ্গ মেয়েটি থমকে দাঁড়াল ।
তারপর হিহি করে হেসে বলল :
ঘর, আমার তো ঘর নেই ।

আমাদের ঘর নেই, আমাদের ঘর নেই,
আমাদের ঘর নেই । সমুদ্রের ঢেউ,
জানলা দিয়ে দেখি, আছড়ে পড়তে লাগল
ডুবো পাহাড়ের গায়ে ।

প্রবাসী বন্ধুরা ফিরে আসুক
ঘরে ফিরে আসুক ।

অসতর্ক

চলতে চলতে আলতোভাবেই দেখেছিলুম
সত্যি বলতে তেমন করে তাকাইনি।
অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে গ্রামের ধারে পৌঁছে দেখি
অবিশ্বাস্য ভিড় জমেছে। ব্যাপারটা কী?

কী আশ্চর্য! আমার জন্যেই অপেক্ষমাণ এই জনতা;
আমার জন্য ফুলের মালা, উঁচু মঞ্চ।
অবাক হবার আগেই সবাই জড়িয়ে ধরে
বলল, তোমার কী সৌভাগ্য দেখলে তাকে, দেখে এলে!
ধন্য তোমার মানবজন্ম, ধন্য ধন্য!
মঞ্চে দাঁড়াও, বলো বলো, কেমন তুমি দেখে এলে।
কেমন অঙ্গ, কেমন রঙ্গ, কেমন বা তার সঙ্গসুধা
কোন সুগন্ধ তার বাতাসে।

হায় রে, আমি আলতোভাবেই দেখেছিলুম।
এখন সন্ধ্যা অন্ধকারে
ফিরে যাবার আবার দেখার উপায়ও নেই।

নরেন মাস্টার

বানান, উচ্চারণ, অর্থ এবং প্রয়োগ
সব কিছুই আমাকে ভুলভাল শিখিয়েছিলে, মাস্টার।
আমার কথা শুনে চালাক লোকেরা হো-হো করে হেসে ওঠে
বোকারা তাকিয়ে থাকে হাঁ করে
আর আস্তিনগোটানো জোয়ানেরা বলে:
ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দে লোকটাকে।

শেয়াল আর গাধাদের মানুষ বানাবার পণ্ডশ্রমে
থামের মতো শক্ত আর সহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলে তুমি।
আমার সে ধৈর্য নেই মাস্টার, শিরদাঁড়ায় তত জোর নেই।
আঘাত খেতে খেতে বাধা পেতে পেতে
আমি এখন বোবা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।
তুমি আমায় সব কিছুই ভুলভাল শিখিয়েছিলে, মাস্টার,
ভুলভাল শিখিয়েছিলে।

এখন আমি গুটিয়ে নিয়েছি আমার লাটাই।
ভিড়ের দিকে পা বাড়াই না, উঁকি দিই না প্রতিবেশীর ঘরে,
কথা বলি একমাত্র নিজের সঙ্গে।

তবুও যখন পাড়ার চ্যাংড়া ছেলেছোকরারা
আমার খড়খড়ি তুলে মুখ ভেংচে বলে :
কোন্ ইশ্‌কুলে পাঠ নিয়েছিলে, দাদু ?
তখন আমি কিন্তু মোটেই চুপ করে থাকি না।
বুক ফুলিয়ে বলি : কেন, নরেন মাস্টারের পাঠশালায়।

বিদায়-সম্ভাষণ

তা অন্তত তিরিশ বছর
ঘুরছি চারদিকে এ-বাড়ির ;
খুঁজে পাইনি প্রবেশের দ্বার।
শাস্ত্রে যত মন্ত্র লেখা আছে
উচ্চারণ করেছি এবং
বাদ দিইনি যৌগিক ক্রিয়াও ;
প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি সর্বদা।
খুঁজে পাইনি প্রবেশের দ্বার ॥

তবে হ্যাঁ, বললে বলতে পারি
অলিন্দের কাচে আবছা ছায়া
অপার্থিব সেই সুন্দরীর
আচমকা দেখেছি দু'একবার।
প্রাপ্তি বলতে সেই সেটুকুই ॥

এসো তুমি উজ্জ্বল যুবক
এসো তুমি আশাপূর্ণ চোখ
খুঁজে পাক উৎসাহ তোমার
এ-বাড়ির প্রবেশের দ্বার !

রিপোর্ট

মারা যাবার পর
ঈশ্বরের কাছে গিয়ে বলব :
আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি

সূর্য যথারীতি তার কর্তব্য পালন করেছে,
সকালে উঠেছে বিকেলে অস্ত গেছে ;
সংগ্রাম করেছে শ্রাবণের মেঘের সঙ্গে ।
কিন্তু তবু এক দারুণ অন্ধকার
সারা পৃথিবীকে গিলে খাচ্ছে ।

মন্তব্য

তোমার কবিতার বইটি পড়লুম ।
প্রত্যেকটি কবিতার শেষ লাইনে এসে
রীতিমতো চমকে উঠতে হয় ।
মনে হয় তুমি শেষ থেকেই শুরু করেছ যেন !
পণ করেছ পরাজয় স্বীকার করবে না,
বরফে বরফে ঘষে আগুন জ্বালাবে ।

সব থেকে বড় কারিগর কিন্তু
ঠিক এমনটি করেন না ।
তিনি শেষ পর্যন্ত থেঁতলে দেন
প্রত্যেকটি গোলাপ ফুলের পাপড়িকে,
বীর সৈনিককে বাতে পঙ্গু করেন,
দাঁত উপড়ে দেন সেরা সুন্দরীর ।
নাকি খোদার উপর খোদকারিটাই শিল্প !

আত্মঘাতী বন্ধুর প্রতি

বলেছিলে, অনেক কিছুই আছে ভালবাসবার :
গাছপালা, পশুপাখি মেঘরৌদ্র পাহাড়সাগর
নাচগান ছবি বই, আহার্য কত কী !
আছে গন্ধ আছে স্পর্শ, নিপুণ হাতপায়ের খেলা স্টেডিয়ামে
নারী শিশু বন্ধুজন তারা তো আছেই ।

ভাললাগা ভেসে থাকত তোমার দু' চোখে ।

সেই তুমি হারালে নিজের প্রতি ভালবাসা !
সব আলো মুছে নিয়ে ডুব দিলে ঘোর অন্ধকারে ।
কিন্তু কেন ? ভালবাসতে না তো অন্ধকার ।
যেহেতু ঈশ্বর অন্ধকার শান্তহিম ঘরেই থাকেন

কোনোদিনই অন্ধকার এবং ঈশ্বর তোমাকে টানেনি।
কোন বিপরীত স্রোত টেনে নিয়ে গেল অপ্রেমে ?

নাকি তুমি বানানো কথার রাজ্যে বাস করতে, জাত-অভিনেতা ?

চিঠি

মরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।
চোখের সামনে একে একে
কত লোককে মরে যেতে দেখলাম
যুবক বৃদ্ধ ব্যর্থ অব্যর্থ কত লোককে।
দেখলাম কেমন ধূসর হতে হতে
একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তারা।
আর আমরা যারা তাদের চিনতাম
আমাদের মৃত্যু হলে
তাদের শেষ স্মৃতিটুকুও লুপ্ত হয়ে যাবে।

কীর্তির কথা তোলা হাস্যকর।
আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি
ক্রিয়া শেষ হবার মুহূর্তেই
কীর্তির সঙ্গে কর্তার যোগসূত্র
ছিন্ন হয়ে যায়।
আমাদের সন্তানেরা অন্য প্রাণ, অন্য দেহ,
অন্য সত্তা নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে।

তাই জীর্ণ কুটিরের মতোই হোক
বা উত্তুঙ্গ মিনারের মতো
আপেলের মতোই হোক
বা আখরোটের মতো
যে-কোনোভাবেই বেঁচে থাকা ভাল।
বেঁচে থাকা মানে একটি চলমান মুহূর্তকে
ক্ষণিক আঁকড়ে থাকার সুখ বা দুঃখ।
দেহ ক্লান্ত হয় কিন্তু মন তো অক্লান্ত পরিশ্রমী।

তা ছাড়া অনেক অনেক বর্ষার পর
হয়তো একদিন শীতের সন্ধ্যায়
পুরনো বন্ধুর চিঠি আসতে পারে।

একটি ছবি

সবাইকে একদিন ধ্বসে পড়ার
শব্দ শুনতে হয় ;
কেউ কান দেয়, কেউ দেয় না।

খিড়কি পুকুরের ভাঙা ঘাটে
ঠাকুমাকে রোজ ঝামা ঘষে ঘষে
শ্যাওলা তুলতে দেখেছি।
ওদিকে ঠাকুর্দা তাঁর পুজোর ঘরে অনড় :
অহোরাত্র ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ॥

নিম-তেঁতুলের ডাল নুয়ে পড়েছে জলে
ঠাণ্ডা অন্ধকার থেকে নবীন হাঁসের দল
সাঁতরে চলেছে বুটিদার চৌকো আলোর দিকে
আর ঠাকুমা একমনে ঝামা ঘষে ঘষে
ঘাটের শ্যাওলা তুলছেন।

ছবিটা আজকাল প্রায়ই মনে পড়ে ॥

কেবলই ভুলিয়ে রাখো

কেবলই ভুলিয়ে রাখো অন্তহীন গল্পের জাদুতে।
সহস্র রজনী কাটে, আরও আরও সহস্র রজনী
ফুরোয় না তবুও তোমার
ফুরোয় না ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস।

যখনই ক্লান্তি আসে, প্রায়ই আসে,
চমকে দাও অন্য শিহরনে।
মাঝরাতে ঝড় আনো, আদিগন্ত বিদ্যুৎ ঝলক
তারপরই সূর্য ওঠে।
আবার নতুন দিন, ব্যস্ততা রাস্তায়
উজ্জ্বল যুবকদল, যুবতীরা এখনও যুবতী।

অনামী কান্নায় যায় এই বুঝি ভেঙে যায় বুক।
না, না, তুমি তখনই আবার
মঞ্চের আলোয় টেনে আনো
বিবেক অথবা বিদূষক।

দুঃস্বপ্ন

ঘুম ভেঙে যায় রোজ
রাত একটা সাতাশ মিনিটে ।
তারপর ঘুম আর আসে না
ঘুম আর আসে না ।

পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে
দু'দিকে নেমেছে ঢালুপথ ।
গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে
একটি মিশেছে গিয়ে
লোকালয়ে উৎসবমুখর,
অন্যটি অতল শূন্যতায় ।

পাহাড়চূড়ায় আমি একা নিঃসহায়
সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে
টাল খাই বেহুঁশ মাতাল ।
টাল খাই যাই যাই
দ্রুতবেগে গড়াতে গড়াতে
ঘুরে ঘুরে নেমে যাই
আরও নীচে আরও অন্তহীন...

ঘুম ভেঙে যায় রোজ
রাত একটা সাতাশ মিনিটে ।

ছিল

এখন কেবল ঘুরেফিরে ফিরে-যাওয়া
সামনে যেতে পিছন দিকে আকুল চাওয়া ।
সকালবেলায় শিউলিতলায় শিশির ছিল
অরুণরঙে অঙ্গ আমার রাঙিয়েছিল ।
দুপুরবেলায় শীতল দিঘির কালো জলে
বাবলাছায়ার ফাঁকে মেঘের উড়নি ছিল ।
ছিল ছিল ছিল তোমার নয়ন ভরা
ভালবাসার কাছে আসার ভাবনা ছিল ।

বিকেল যেন ফুরিয়ে-যাওয়া গাছের ডালে
একলা পাখির ঝিমিয়ে-পড়া বসে থাকা ।

উঁচুনিচু পিছন পথে আঁকাবাঁকা
এখন কেবল ঘুরেফিরে ফিরে-যাওয়া।

ওয়াজেদ আলি

তৈরি করব নতুন বাড়ি
এই মতলব ছিল আমার ;
আমার এবং আমার মতো
আর কয়েকজন নবীন যুবার।
যখন আমার বসতবাটী
ভাঙা ইঁট আর শুকনো মাটি,
মেলাতে শেষ পুতুল-নাচও
বন্ধুরা সব কেমন আছ,
তখন দেখি ডোবার ধারে
আমার বেটাই উজির মারে।
কিছুই তবে রয় না খালি
বেঁচে থাকুন ওয়াজেদ আলি।

ভানুমতীর খেলা

অনেকদিন তাকে-তাকে থাকার পর
ধরে ফেলেছিলুম ধূর্ত শব্দ একটা।
যাচ্ছিল সে পুকুরপাড় দিয়ে
সম্ভবত ঠাকুরবাড়ির ফুলবাগানে।

ধরামাত্রই ডাইনেবামে উপরনীচে
সামনে এবং পিছনে আমার হাজার হাজার
শব্দ এসে সে কী দারুণ গোল বাধাল
ধৃত শব্দটাকে মুক্ত করার জন্যে।

আমি একটা গণ্ডি কেটে মধ্যিখানে
শিকারটাকে রেখে দিলুম।
অতঃপর চোখ বুজিয়ে বসে রইলুম পুকুরপাড়ে।
দেখি কী হয়!

শব্দগুলো পরস্পরের সঙ্গে আমার সারা অঙ্গে
বিচিত্র সব ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে

জড়াজড়ি কামড়াকামড়ি করতে করতে
হাত পা ভেঙে ডানা খসিয়ে হুল ভেঙে বা
হন্যে হয়ে অবশেষে কনুই বেয়ে কবজি বেয়ে
মুঠোর মধ্যে চলে এল ।

ধরেছিলুম মৌমাছি এক
মুঠো খুলতে দেখি একটা গোলাপ বটে ।

কিন্তু ভানুমতীর খেলা সবসময়ে ঘটে না তো ।
অনেক অনেক শব্দ আছে যারা বড়ই একা-একা
ধরা পড়লে তাদের জন্যে কেউ আসে না
কেউ কাঁদে না, কৌতূহলে উঁকি দেয় না ।
কী-যে করি
বিবিক্ত সেই শব্দগুলোই এখন আমার জালে ওঠে

খুঁজে পাওয়া

তোলপাড় করেছি বিছানা ।
উল্টেছি চাদর, বালিশের ওয়াড়, লেপতোষক
খুঁজতে বাকি রাখিনি খাটের তলা,
আলমারির মাথা, টেবিলের ড্রয়ার,
লক্ষ্মীর তাক ।
সারাদিন যেখানে-যেখানে গেছি
মনে মনে হেঁটে এসেছি আবার ।
কোথাও নেই ।
ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছি যখন
দেখি জিনিসটা আমার
হাতের মুঠোতেই রয়েছে ।

নাম

জ্ঞানীরা বলেন নাম না জানলে
কিছুই তো জানা যায় না,
সবই ঢাকা থাকে অপরিচয়ের কুয়াশায় ।
নাম ধ্যান করো, জপ করো নাম
নাম শোনো নিশিদিন ।
কবিও বলেন, বলো, সখী, বলো
তার নাম কানে কানে ।

পাখি তো অনেক দেখেছি পাহাড়ে
জঙ্গল শহরেও
কিন্তু তাদের কটার বা নাম জানি ?
কত-যে বৃক্ষ দিয়েছে তৃপ্তি
শান্তি সঙ্গসুধা
জানি না যাদের নাম ।
আর যে-কিশোরী জীবনে প্রথম ঢেউ তুলেছিল বুকে
নামধাম তার এখনও অজানা ।

আমি রূপ নিয়ে থাকি ।

ন'টা পঞ্চান্ন

আমি একটু আগেই এসে পড়েছি
তাই না কপাট বন্ধ ;
রাস্তায় ভিড় খুব পাতলা, রৌদ্রে শৈশবের গন্ধ
যানবাহনে অবিশ্বাস্য মন্থরতা ।
আমি একটু আগেই এসে পড়েছি ।

কী করব বলুন তো ? ফিরে যাব ?
না কি এখানেই অপেক্ষা করব,
বসে পড়ব লাল রকটার ওপরে
কি আর একটু হেঁটে পার্কের ওই বেঞ্চিটাতে ?
আমি একটু আগেই এসে পড়েছি ।

আমি একটু আগেই এসে পড়েছি
তাই না পলাশের রং আমার চোখে পড়ল
চোখে পড়ল, কত কতদিন বাদে চোখে পড়ল
এই মুণ্ডহীন শহরে একমুঠো বালির ওপরে
চড়ুই পাখির খেলা,
অনেকদূর পর্যন্ত রাস্তার বিস্তার
ট্রামলাইনের ঝিকিমিকি আর
ত্রিকোণ জমিতে আহ্লাদী বিদেশি ফুল ।
আমি একটু আগেই এসে পড়েছি ।

আর একটু বাদেই আপনারা এসে পড়বেন
উত্তাল ঢেউ-এর বেগে উন্মত্ত ব্যতিব্যস্ত ।
আর আমি ? আমি একপাশে সরে যাব, না
আপনাদের মধ্যেই নিঃশব্দে মিশে যাব ?

অন্য ঈশ্বর

উপরে উঠব না আর। সিঁড়ি ভাঙতে বড় কষ্ট হয়।
ঈশ্বর কেন যে এত উঁচুতে থাকেন!
বরং গঙ্গার ঘাটে সমতলে মানুষের ভিড়ে
ডুব দিয়ে তারপর ছুড়ে দেব মাঝদরিয়ায়
একটি চন্দনরিক্ত কিন্তু আরক্ত জবাফুল।
সেই ফুল ভেসে যাবে স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণ
এ-ঘাট ও-ঘাট ছুঁয়ে, ঢেউ ঠেলে, আরও ঢেউ ঠেলে
অবশেষে একদিন নদীর উৎসমুখে যাবে না কি
যেখানে অপেক্ষমাণ দীনবন্ধু
আরেক ঈশ্বর?

পঞ্চাশের পর

পঞ্চাশের পর নিজের সামনে দাঁড়িয়ে
কে আর না হাউমাউ করে ওঠে?
হাঁ, যারা আত্মতুষ্ট, হাবাগোবা
তাদের বাদ দিয়েই বলছি।

আজকাল প্রায়ই আমি উধাও প্রান্তরে
শেষরাতের চাঁদ দেখতে পাই।
এই ঢেকে যায় মেঘে, হালকা হাওয়ায়
ওই আবার বিবর্ণ মুখশ্রী ভেসে ওঠে।
কিছুই তো কিছু নয় এই বোধ বুক চেপে ধরে।

যাও, ডুবে যাও চাঁদ। প্রেতচ্ছায়ার চাইতে
অন্ধকার শতগুণে ভাল।
আমাকে আমার সামনে টেনে এনে
হাজির কোরো না।

লোকটা

মাটিতে পা দিয়েই হেঁটে আসছে,
ইচ্ছে থাক বা না থাক
ভিড়ের মধ্যে একাকার।
অনেক শব্দ শোনে, অনেক অনেক ধ্বনি;
বোবা হয়ে থাকে।

তার যা-কিছু চিৎকার
নিজের মধ্যে।
আর সেই চিৎকার
ঘুম থেকে উঠে
আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত।

হুজুরের কাছে নিবেদন জানানো বৃথা :
প্রত্যেকটি সর্ষের মধ্যেই ভূত।
তেমন ইংরেজি জানে না যে
রাগী প্রবন্ধ লিখে গায়ের ঝাল মেটাবে।
তেমন বাজখাঁই গলা নেই যে
মাঠ ভেঙে লোক জড়ো হবে।

কিন্তু কী এক অদ্ভুত নিয়মে
বড় বড় বিপ্লবের পরেও
আবার স্থিতাবস্থা ফিরে আসে।
মেয়েরা উল বোনে, ছেলেরা ফুটবল খেলে,
শিশুরা বেলুন ওড়ায় ;
সিনেমার পর্দায় যথারীতি ট্রেন চলে।

অনেক প্রতীক্ষা এবং সংগ্রামের পর
বাসের পা-দানিতে তিন আঙুলের জায়গা।
জুড়ে থাকা ঘেমো কাঁধের ফাঁকে
শ্যামলা মেয়েটার খোঁপার দিকে
একবার তাকানো আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়া
আবার তাকানো আর চোখ ফিরিয়ে নেয়া।
পাশের লোকটিকে জানতে দেয় না।

বাবা

আমার বাবা মারা গেছেন একান্ন বছরে।
আমি এখন বাবার চেয়ে বড়।
চুয়ান্নতে পা দিয়েছি চুলগুলো প্রায় সাদা।
ভিতর থেকে দূরে জড়োসড়ো
এই ঘরে, এই ঘরের মধ্যে আসা এবং যাওয়া।

কিন্তু যখন বাবার কথা ভাবি
মুহূর্তেই বালক হয়ে যাই

ছেঁড়া ইজের হাতে ভাঙা লাটাই
ফিরে আসে উনিশশো পঁয়ত্রিশ ।
উড়ে বেড়াই সারা আকাশ জুড়ে

সহজ তো নয় কচিৎ কখন বাবার কাছে যাওয়া ।

পাণ্ডুলিপি

পাতায় পাতায় সবই লেখা আছে ।
লেখা হয়েছিল সেই কতদিন আগে
যখন নিজস্ব ছিল এই বিশ্ব এবং আকাশ
এখন তোমার যেমনি, সে-রকম ।

যে পাতাটা খুশি পোড়ো যদি ইচ্ছে হয় ।
বিবর্ণ অক্ষরগুলো মৃত এক কিশোরের ছবি
কাটাকুটিগুলো তারই কুড়িয়ে-আনা অজস্র ব্যর্থতা ।
ফাঁকে ফাঁকে দু'একটি বুনো ফুল
হয়ত বা ঘ্রাণ পেতে পারো ।
কিন্তু বানানগুলো সংশোধন করে নিয়ো নিজে ।

বসুন্ধরা

বস্তুত তুমি এত লাবণ্যময়ী
সাহস হয় না সামনাসামনি দেখতে
দূর থেকে এক মুহূর্ত চোখ ছুঁয়ে
পালাই অন্য আঁধারে তৎক্ষণাৎ ।

ভাসে তারপর সারাদিন সারারাত
স্বপ্নে কেবল তোমারই মুখচ্ছবি
এত কাছে থাকো দেখা যায় এত কাছে
তবুও পারি না সামনাসামনি দেখতে ।
একাগ্র আমি ছিলুম না কোনোদিনই
বারবার তাই মজেছি হাজার প্রেমে ।

এখন তোমার ছবিতে ছায়ায় বুঝি
ফিরে পাব ধীর অনন্ত যৌবন ।
ওগো অসহ্য অকরুণ রূপবতী

মরে যাই ভীরু লজ্জায় সঙ্কোচে
যত কাছে টানো তত দূরে চলে আসি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে তোমারই বিম্বাধরে

নাম

কতদিন পরে বহুদিন পরে
বাতাসে শরীর ছড়িয়ে দিলাম
ঝরে পাতাগুলো শুকনো পাতারা
আহা পাতাগুলো বলে তার নাম।

বলে তারই নাম বারবার বলে
ঝরে যাওয়া পাতা বলে তার নাম।
শরীরে আমার হৃদয়ে আমার
অতলে আমার নাম তারই নাম।

তার নাম তার নামের গন্ধ
স্পর্শ তীব্র তিক্ত স্বাদ
মধুর মধুর মধুর মধুর
বিষাদ বিষাদ বিষাদ বিষাদ!

ইতিহাস

এই কথা লিপিবদ্ধ থাক
ফুরিয়ে যায় সব হাঁকডাক
কালক্রমে।
কাছারি বাড়ির শ্বেত পাথরের বারান্দায়
শ্যাওলা জমে;
গায়ে-গায় একপাল ছাগল শুয়ে থাকে;
বাগানে জীর্ণ গরু হাম্বা হাম্বা ডাকে;
হতাশ কুকুর ফিরে যায়।
কাছেই একটানা কান্না কী একটা পাখির।
আহা কী দাপট ছিল নেপালি দ্বারীর
একদা। কোথায়, কোথায় গেল তারা?
খসে পড়ে নখদাঁত, গর্বিত পলাশ ফুল,
বৃদ্ধ পলেস্তারা।

ভেবে দেখেছি

কিছুই নিয়ে যাওয়া যায় না এমনকি স্মৃতিটুকুও
তাই সবকিছুই রেখে গেলাম
সামান্যই আমার সর্বস্ব
তবু দরকার হলে ব্যবহার করতে পারো
কৌতূহল হলে পুঁটলি খুলে দেখতে পারো
যত্ন করে রাখা টুকিটাকি
কবিতার বইয়ের মধ্যে রাখা অশথপাতা—
আর দ্যাখো,
কাঞ্চনফুলের গাছটা আমার বড্ড প্রিয় ছিল
যদি মনে থাকে কোনো কোনো শীতের দুপুরে
ওর দিকে একটু প্রেমিকের দৃষ্টিতে
চোখ বুলিয়ো ।

পৌষের কবিতা

ফুল নিয়ে যাও তুমি
আর আমার প্রয়োজন নেই
ফুলখেলা হয়েছে অনেক ।
এখন শুধুই শীত
হুহু বয় উত্তরের হাওয়া
মন চায় আগুনের সেঁক ।
বরং নিকটে এসো
কাছে আরও কাছে এসো দেখি
পাই যদি বুকের উত্তাপ
এই দেহ এই মন নিয়ে
স্নায়ুদের ফুঁ দিয়ে জাগিয়ে
দিই এক ঝাঁপ ।
কিন্তু নেই তোমার শোণিতে
রে প্রকৃতি, রে ছলনাময়ী
আগুনের সামান্য ফুলকিও ।
ফুল নিয়ে যাও তুমি,
যে এখন আরম্ভ করেছে
তার হাতে দিয়ো ।

অভিনয়

তুমি যা চেয়েছিলে পারিনি দিতে
আমার পুঁজিপাটা কিছুই ছিল না।
তুমি তা জানতে না। জানতে দিইনিকো
আমার জামাকাপড় কতটা জীর্ণ।

আমি যে দুর্বল গরিব কত
তুমি তা জানতে না। তোমার আশা
আমার সাধ্যকে দু'চার তলা ভেবে
বাড়িয়ে দিয়েছিল লম্বা হাত।

সুঠাম সুন্দর তোমার আঙুলের
ঢেউয়ের তালে তালে আমার মন
নাচতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনিকো,
পালিয়ে এসেছিল নিজের খুপরিতে।

সেখানে নরকের ভয়াল রাক্ষুসি
আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তখন খাচ্ছিল।
কিন্তু যন্ত্রণা বুকেতে চেপে রেখে
তোমার কাছে হাসিমুখেই দাঁড়িয়েছি।

আজকে তুমি নেই। চিঠির বাক্সে
পাব না মিলনের মধুর আহ্বান।
তবুও এটুকুই পরম সান্ত্বনা
আমার অভিনয় ভালই হয়েছিল।

কৈফিয়ত

সবাই তৈরি ছিল, সব্বাই।
শুধু আমারই ধুতিটা
ঈষৎ ময়লা ছিল, মানে,
পাঞ্জাবির সঙ্গে ঠিক মানাচ্ছিল না বলে
ঘর থেকে বেরুতে একটু দেরি হল।
সন্ধ্যা নেমে এল শহরের পথে পথে
সাহিত্যসভায়, সংগীতের জলসায়
ময়দানের বিরাট মিছিলে।
আধো-অন্ধকার এই বড় ভালবাসি।

সব কিছু একাকার করে দেয় এই অন্ধকার
মলিন ধুতির সঙ্গে ধবধবে পাঞ্জাবির
তেমনটা তফাত থাকে না আর
বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে
সুরের তরঙ্গ বয়ে যায় এই অন্ধকারে ।
আশা করি মার্জনীয় আমার দেরিটা ।

বন্যা

আকণ্ঠ জলের মধ্যে
দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বুড়ো বটগাছের শিকড়
মানুষ মানুষ বলে চিৎকার করার
এই তো সময় ।

কিন্তু মানুষ কই ?
পচাগলা মাংসপিণ্ড যুবাবৃদ্ধ শিশু ও নারীর
খরস্রোতে ভেসে যায় গোরুমোষ কুকুর-বিড়াল
বাঁশের শালের খুঁটি ভাঙা টিন
নিঃসঙ্গ তালপাতার ভেঁপু মেটে হাঁড়ি
এবং খড়ের চাল রবীন্দ্রকাব্যের প্রচ্ছদ ।

আকণ্ঠ জলের মধ্যে
চারদিকে হিংস্র খরস্রোত
মানুষ মানুষ বলে হাঁক ছাড়ি
উত্তর মেলে না ।

আপাদমস্তক ঢাকা ওরা কারা ?
খুন করে নিয়ে যাচ্ছে মানুষের সম্মানের লাশ
আশা-আকাঙ্ক্ষার ঝাঁপি
গৃহস্থের আজন্ম সঞ্চয় ।
ওরা কারা ? ভূত দেখে শিউরে উঠি
ভয়ে নয়, ঘৃণায় লজ্জায় ।

তবু এই—এই-যে শিকড়
এ-কী শুধু আপ্তবাক্য, ছাত্রের উদ্ধৃতিমাত্র
পরীক্ষার নিষ্ফল খাতায় ?
না, না, তা তো হতেই পারে না !
চলচ্ছক্তিহীন, তবু চোখে আজও দৃষ্টি আছে ঠিকই
কালা হয়ে যাইনি এখনও ।

নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠি তাই
মানুষকে মানুষ ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারে না
মানুষকে মানুষ ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না

গৃহপালিত

চোখের সামনে দাউ দাউ আগুন জ্বলে।
ঘর পুড়ে যায়, একের পর এক ঘর পুড়ে যায়।
শিশুরা কাঁদে, স্ত্রীলোকেরা বুক চাপড়ায়
আর হাড়হাবাতে মানুষ হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকে।
শুধু দু'একজন—দু'একজন শুধু
ঝলসানো জামা গায়ে জলের খোঁজে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

তারপর ক্রমেই গা-সহা হয়ে যায় সবকিছু।
নতুন তেজে আগুন জ্বলতে থাকে
আর যারা ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়েছিল
সদম্ভে মাংসের বাটিতে রুটি ডোবায় তারা।

নিরাসক্ত পথিক নিজের গা বাঁচিয়ে
এক চোখ বুজে নিরাপদ খাটিয়ায় ঘুমিয়ে থাকে—
তারপর একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে
শরীরে আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে
গলা থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে
একটি পরিচিত গৃহপালিত জন্তুর।

পরম তৃপ্তিতে তার চোখ চকচক করে।

পণ্ডশ্রম

কী হবে কবিতা লিখে ?
দীর্ঘকাল কবিতা লিখেছি।
বরং দিঘির ধারে বসে থাকা ভাল
দুপুরে নির্জনে।
যখন অশত্থপাতা
ঝরে পড়ে কোলের উপর,
জলের উপরে
জলমাকড়সার বৃত্ত মুছে যায়
এবং হঠাৎ হাওয়া

পুরনো বন্ধুর মুখ
চকিতে দেখিয়ে চলে যায়,
তখন যে অনুভব
ছায়া ফেলে অর্ধচেতনায়
তা কি নয় শব্দের অনধিগম্য
দুর্গম সুদূর ?

ডাউসন

কাল রাতে, আহা পূর্ণিমার রাতে
ছাদের ওপর পাইচারি করতে করতে
তোমার সঙ্গে কথা বলছিলাম ডাউসন
হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল
বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে
রোগা লিকলিকে একটি কিশোর
একমাথা চুল দুলিয়ে দুলিয়ে
চিৎকার করে তার কবিতা আবৃত্তি করছে ।
আকাশে মস্ত বড় চাঁদ
ঘাসের ওপর ছেঁড়া সতরঞ্চি বিছানো
কিন্তু একজনও শ্রোতা নেই, একজনও শ্রোতা নেই
শুধু দর্শক একমাত্র আমি ।

ইদানীং বড় বড় কবিদের খুব একটা
পছন্দ হয় না আমার ।
বড়ই পরিশ্রমসাধ্য তাঁদের কাছে পৌঁছনো ।
তুমি ছিলে নেহাত মাঝারি মাপের কবি
আরনেস্ট ডাউসন,
তাই আমার খুব কাছের, আমার নাগালের মধ্যেই ।
আমি তোমার কাঁধে হাত রেখে
অনায়াসে বসতে পেরেছি একদিন
কলকাতার এক অখ্যাত শুঁড়িখানায় ।

শীত

রাত্রিদিন অশান্তির খণ্ডরাজ্য,
হে শরীর,
তোমাকে মানচিত্র থেকে

লুপ্ত করে দেবে যে-নায়ক
সে এসে দাঁড়িয়েছে দ্বারে
স্থিরলক্ষ্য ধনুর্বাণ নিয়ে ।
ঝরাও মুকুলগুলি
লুব্ধ করো বাতাসের ঠোঁট ।
হা-হা অস্থি, হো-হো রক্ত, হি-হি মজ্জা
ঝরাও মুকুলগুলি
শান্ত হও সূর্যের আশ্লেষে ।
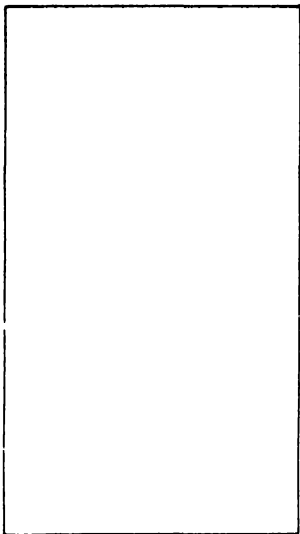
সূচিপত্র

বাবুন-রিমা-শম্পা-বুকুন-কে

১
ও হরি, ও হরি তুমি কোথায় থাকো ?
লাল বাড়িতে ?
রোজ রোজ দাও কেন
চাল হাঁড়িতে ?
চড়ো নাকো কেন তুমি ট্রামগাড়িতে ?

২
এই কাক, কালো কাক
শুনে যা ।
কোনখানে যাবি তুই
বলে যা ।
যেইখানে যাবি তুই
সেখানে
আছে কি রে ময়রার
দোকানে
ছোট ছোট বড় বড়
জিলিপি ?
বনবন ঘুরপাক
ওড়ে যা ?

৩
টিকটিকি দেয়ালে
আছে কোন খেয়ালে ?
ওটা আরশুলা খাবে
তারপর ঘরে যাবে ।
ঘরে যাবে চুপি হেঁটে
জরিদার টুপি এঁটে ।
ছবিটবি মাড়িয়ে
কড়িকাঠ ছাড়িয়ে ।

৪
টগবগ টগবগ দেয়াল ঘড়ি
ঘাড়টাকে তোর জড়িয়ে ধরি ।
ঘাড়টা-যে তোর শক্ত বড়
মটর ভাজার কড়োমড়ো ।
এই চুপ কর বুড়োবুড়ি

আমরা খাব ভুনখিচুড়ি।
বুড়োবুড়ি যেই মরেছে
খিচুড়িটা জুড়িয়ে গেছে।

৫
নরওয়েতে গ্রীষ্মকালে
সূর্য অস্ত যায় না।
শোন শোন শোন
শোন রে তোরা
রাত সেখানে হয় না।
রাত সেখানে হয় না, তবে
লোকগুলো সব ঘুমোয় কবে ?
সেই কথাটাই ভাবছি কষে
এপাশ ওপাশ তক্তপোষে।
দরজা-জানলা বন্ধ করে
লোকগুলো কি ঘুমোয় ওরে ?
হাওয়া হয়ে যায় যে হাওয়া।
চুলোর দোরে খাওয়া দাওয়া ?

৬
বাঘমুখো বাস, আমার সঙ্গে
বেড়াতে যাবি পূর্ববঙ্গে ?
তুই পঁকপঁক, আমি চাকা,
ছুট্টে চলে যাব ঢাকা।
না, তুই চাকা, আমি বাজাব
বিশ নয়াতে ইলিশ খাব।
গড়গড়াতে মুখ বেজার ?
থাক বেঁচে থাক বাগবাজার।

৭
বুকুনের জন্মদিনে
বড়জেজে আনল কিনে
পাতা-ভরা গোরুর গাড়ি।
গোরুদুটো চকচকে শিং
নাচে খালি তিড়িংবিড়িং ;
ভয়ে লোক পালায় বাড়ি।
পালিয়ে আর কী হবে
গোরুদুটো হাম্বারবে
সিঁড়ি বেয়ে চিলের ছাতে

উঠে গিয়ে ওড়ায় ঘুড়ি।
ঘুড়ি নয়, ধাম্‌সাপানা
কালো কাক মেঘের ছানা।
ভয়ে মরে চাঁদের বুড়ি
আকাশের এক কোনাতে।
বুকুনের হেঁই হটহট
শুনে বুড়ি আনে চটপট
হাঁড়িভরা নরম আলো।
খায় তাই সব লোকেরা
চেয়ে চোখ পটলচেরা।
তবে গোরু নাচ থামাল।

মিল-অমিল

রাম ভালবাসে মোরগমশলা
শ্যাম কাঁচকলা হিং
একটা ব্যাপারে দুজনের মিল
চায় না লোডশেডিং।

শ্যাম ভালবাসে গ্রীষ্মের তাপ
রাম কনকনে শীত।
কিন্তু দুজনে মশগুল শুনে
রবীন্দ্রসংগীত।

কেউ ভালবাসে মিষ্টি কেবল
লঙ্কার ঝাল কেউ।
কিন্তু কেউ না পছন্দ করে
কুকুরের ঘেউ ঘেউ।

মানুষে মানুষে গরমিল যত
মিলটা কি তার কম ?
তাই ছুটে যাই বন্ধুর বাড়ি
বেহালা কি দমদম।

কলকাতা

থাকবে কি আর কলকাতা এই
কলকাতাতে ?
উড়বে কি আর রঙিন ঘুড়ি
চোদ্দতলার ছাতে ছাতে ?

থাকবে কি আর মোড়ে গলির
চায়ের দোকান বনমালির
যেমন দ্রুত ভাঙছে বাড়ি
বস্তি খাটাল হাড়হাবাতে ?

থাকবে কি আর সিমলে পাড়া
দরজি পাড়া বোসের পাড়া ?
ছড়িয়ে-পড়া এই শহরের
দাঁড়াব কোন সীমানাতে ?

মাথামুণ্ডু

বুকুনবাবু, যাচ্ছ কোথায় ?
চেয়ার বেয়ে তোমার মাথায় ।
আমার মাথায় তিনটে বাঘ ।
আমার মুঠোয় দারুণ রাগ ॥
রাগ দিয়ে কি বাঘ তাড়ায় ?
তাড়ায় না তো পোষ মানায় ।
পোষ মানিয়ে করবে কী ?
দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি ।
ভাববে কী আর, মাংস চাই,
আচ্ছা, দেব মুণ্ডটাই ॥
মুণ্ডুটা কি মিথ্যেকারের ?
অঙ্কস্যারের, অঙ্কস্যারের ॥

মাছ কেনা

ভাবছ কি সকলেই পারে
ভাল মাছ কিনতে বাজারে ?
টাকাটাই সব কিছু না,

জানা চাই বাড়ি কোন গাঁ,
চকচকে যে-মাছটি ওই
শুয়ে আছে খাসা দশাসই
তার বাপ-ঠাকুর্দা কারা।
নইলে কেনাই হবে সারা :
মুখ তুলে ঠেলবে সানকি
এ-যে দেখি রোহিত ইয়াঙ্কি।

ছড়িয়ে আছে ডুমুরগাছে
মাকড়সার জাল
মধ্যিখানে ধ্যানে মগ্ন
রঙিন মাকড়শা।
বিরাট সাম্রাজ্য তার।
আসমান পাতাল
রেশমি সুতো দিয়ে তৈরি
বিচিত্র নকশা।
পাড়ে পাড়ে ঝলক দিচ্ছে
মুক্তো শিশিরের,
দুলছে হলদে পালক। দ্বারে
তিনটে মাছি বাঁধা।
ফড়িঙ একটা চেষ্টা করছে
ছিঁড়বে গোলকধাঁধা।
কিন্তু রাজার চালচলনের
নেইকো রকমফের।

আমার আমটা খাও

আমার আমটা খাও
ও-দিকটা পচা বটে
এদিকটা মিষ্টি লাগবে খুব।
চান করো আমার পুকুরে
জল সামান্যই আছে
কিন্তু ভাল লাগবে দিলে ডুব।
কেন না সূর্য ডুবে গেলেও পশ্চিমে
আমার চোখদুটো দ্যাখো
চেয়ে আছে পুব।

ছড়া নয়

ছোটরা শুধু ছড়াই ভালবাসে
এমন মিথ্যে কে রটাল ?
আমি জানি শুধুই ছড়া নয়
কবিতাও লাগে তাদের ভাল ।

সেই কবিতা যাতে অনেক ছবি
নদী পাহাড় সুদূর বিদেশের,
হারিয়ে যাওয়া পথের পরে পথ
রোদ ওঠে লাল মেঘের কোলে ফের ।

সেই কবিতা যাতে অনেক গান
পাখি বাতাস অর্থহীন কথার,
ভাসিয়ে নিয়ে যায় চলে যায় ঢেউ
কেবল খুশি অনর্গলিতার ।

হায় রে আজ দেখায় না কেউ আর
চলচ্ছবি এবং গানের মেলা ।
যে যাই বলুক, অনেক হাজার গুণে
ভাল ছিল আমার ছোটবেলা ।
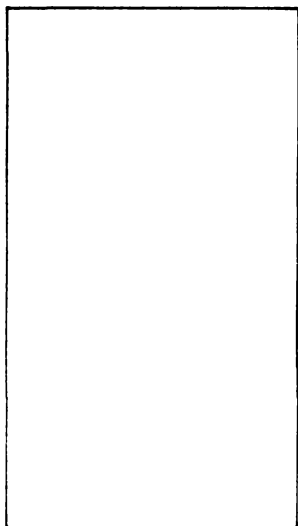
সংযোজনা-৪

সূচিপত্র

যোহান ওলফগাং ফন গ্যেটে

ভাগ্যদেবীর গান

দেবতাদের ভয় কোরো গো, মানব-সন্তান,
রয়েছে তাঁদেরই হাতে শাশ্বত শাসন,
যখন যেভাবে খুশি ওঠান বসান
তাঁরাই যে দণ্ডধর।

যাদের তাঁরা ওঠান, তাদের দ্বিগুণ
ভয়ে ভীত থাকাই উচিত।
গিরিচূড়ায় মেঘের মাঝে পাতা
আসনগুলি সোনার টেবিলধারে।

দেবতাদের ঝগড়া হলে পর
অতিথিদেরই পতন অন্ধকারে
অবজ্ঞা আর ঘৃণার ডুবজলে
বৃথাই ন্যায়বিচার খোঁজা।

দেবতারা সব সোনার টেবিল ঘিরে
নিত্যকালের ভোজসভায় মাতেন
ডিঙিয়ে চলেন পাহাড়, খাদ থেকে
আসছে আসুক পতিতজনের শ্বাস।

প্রভুরা আর দেখেও দেখেন না
একদা কৃপালব্ধ অনুগামীর
গুণপনার ভগ্নশেষ নামীর
অধস্তন পৌত্র পরিবারে।

ভাগ্যদেবী গাইছিল এই গান।
নির্বাসিত বুড়োটা অন্ধগুহায়
সে-গান শুনে কেবল মাথা দোলায়
চিন্তা করে নিজের নাতিপুতির।

রোমের শোকগাথা

এ-প্রাচীন পীঠস্থানে পেয়ে গেছি হ্লাদিত প্রেরণা ;
এখানে আমার সঙ্গে কথা কয় আরও স্পষ্ট করে
ঘনিষ্ঠ আবেগমুগ্ধ অতীত এবং

যে-পৃথিবী সম্প্রতিকালের।
এখানে উৎসুক হাতে প্রজ্ঞানীর উপদেশমতো
রোজ আমি নবতর সুখে পুরাণের পাতা ওলটাই।
কিন্তু সমস্ত রাত মদন আমায়
ব্যতিব্যস্ত করে রাখে অন্য এক টানে ;
আধাজ্ঞানী থাকি যদি দ্বিগুণ সে আনন্দ বিলোয়।
যখন নয়ন ভরে দেখি সুষ্ঠু বুকের গড়ন
এবং আমার হাত ধীরে নামে নিতম্ব প্রদেশে
তখন কি কিছুই শিখিনি ?
তখনই তো, অবশেষে, মর্মরের মর্মস্থলে যাই
তখনই তো ভাবি বসে, টেনে আনি অনেক তুলনা
এবং সংবেদী চোখে চেয়ে দেখি, অভিভূত হই
চক্ষুষ্মান হাতে।
দিনের কয়েকটি ঘন্টা কেড়ে নেয় যদিও প্রেমিক
সে দেয় নিশীথ ভরে, সব ক্ষতি পূর্ণ করে দেয়।
তা বলে সমস্তক্ষণ কাটাই না চুম্বনে চুম্বনে
আমরা কথাও বলি গুরুতর প্রসঙ্গকে নিয়ে।
যদি ঘুম নেমে আসে চোখে তার, চিন্তাভারে আমি কাত হই।
এমনকি কবিতা লিখি, প্রায়ই লিখি, বাহুদ্বয়ে তার,
পয়ারের মাত্রা গুনি পিঠে তার নরম আঙুলে।
যখন সে শ্বাস নেয় সুখাবেশে গভীর নিদ্রায়
দীপ্ত হই, দীপ্ত হয় হৃদয়ের গভীর অতল।
মদন প্রদীপটাকে উস্কে দেয়, ভাবে
অতীতের কীর্তি যত, তুলনীয় কীর্তিকলা তার।

ওয়ালটর স্যাভেজ ল্যান্ডর

বিলম্বিত পল্লব

ঝরে যাচ্ছে পাতাগুলি, আমিও তেমন ;
শেষের কয়েকটি ফুল আকুল নয়ন ;
তাই তো আমারও।
শোনা যায় না কোনো ডালে একটিও পাখির
আনন্দের গান কিংবা ডাক অখুশির
শোনা যায় না কাননেও কারও।

হয়তো আসছে শীত ; নিয়ে আসছে আরও কাছে আগুনের ধার
বছরে বছরে ক্রমে ছোট হয়ে আসা চক্র তার
যেখানে পুরনো বন্ধু মুখোমুখি পুরনো বন্ধুর।

আসুক সে ; মেঘে ঢাকা আকাশ এখন তো
এবং বসন্ত গ্রীষ্ম উভয়েই অতীত বিগত
এবং সমস্ত কিছু সব কিছু যখন মধুর।

হেইনরিখ হাইনে

প্রশ্ন

উপকূলে, নির্জন নিশীথমগ্ন সমুদ্রোপকূলে
যুবকটি দাঁড়াল,
বুকভরা দুঃখ নিয়ে, মনোরাজ্যে সন্দেহের ভার,
এবং বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল সে তরঙ্গমালাকে ;—

"আমাকে কি বলে দেবে জীবনের রহস্য গোপন,
সৃষ্টির আদিমতম যে রহস্য যন্ত্রণাকঠিন,·
যা নিয়ে কত-না মাথা ভেবে-ভেবে হয়েছে অস্থির,
প্রাচীন মিশরদেশি নৈশটুপি পরা মাথা আর
পাগড়িপরিহিত মাথা কালো ওড়না ঢাকা কত শির,
পরচুলে শোভিত মাথা আরও ঢের হাজার হাজার
রিক্ত ঘর্মক্লিষ্ট মাথা কত মানুষের ?
আমাকে উত্তর দাও মানুষের অর্থ কোনখানে ?
কোথা থেকে এল বা সে, যাবে বা কোথায় ?
সোনালি তারার দেশে কারা থাকে দূরে ?"

তরঙ্গ মর্মর তোলে চিরন্তন তরঙ্গমর্মর,
প্রবাহিত হয় বায়ু, মেঘরাশি উড়ে চলে যায়,
ঝিকমিক করে তারা, সবই তারা উদাস শীতল,
কেবল মূর্খ এক অপেক্ষায় থাকে উত্তরের।

নিশীথ-চিন্তা

যখন, জার্মানি, আমি চিন্তা করি তব
নিশীথে, আমাকে তন্দ্রা ছেড়ে চলে যায়,
পারিনে মুদিতে আঁখি সে-আকুলতায়
আমার কপোল বেয়ে তপ্ত অশ্রু ঝরে।

কী-যে দ্রুত ধাবমান ঘূর্ণিত বৎসর !
সেই যে দেখেছি কবে স্নেহময়ী মাকে
দ্বাদশ বৎসর হল ; যত দীর্ঘকাল
অপেক্ষায় থাকি, তত ব্যথা তীব্রতর।

আকাঙ্ক্ষা আমার ক্রমে হয়েছে দুঃসহ ;
সে-নারী করেছে জাদু কটু যন্ত্রণায় !
প্রাণের প্রাচীনা ও রে ! কী প্রদাহ তাকে
মনে করা ! হে ঈশ্বর, রেখো তাকে ভাল ।

আমাকে নিয়েই জানি সে-বুড়ির সুখ,
তার যত চিঠিপত্র পাই দেখি সেথা
একটি কম্পিত হাত কী-যে থরোথরো,—
জননী হৃদয় বুঝি ভাঙে বেদনায় !

সদাই বিরাজে মাতা হৃদয়ে আমার ;
কী দীর্ঘ সুদীর্ঘ বারো বৎসর কেটেছে,
বারোটি বৎসর একটি অন্যের পশ্চাতে
সেই যে পেয়েছি মাকে বুকে, তারপর ।

যুগান্তে যুগান্তে রবে উন্নত জার্মানি ;
অন্তরে অন্তরে খাঁটি রম্যভূমি সেই !
তার ওক, লিন্ডেন বৃক্ষ চিরকাল
যেমন দেখেছি থাকবে অপরিবর্তিত ।

তত্রাচ জার্মানি কিছু অল্প দিত টান
যদি না থাকত সেথা জননী আমার ;
পিতৃভূমি কোনওদিনও হবে না শ্মশান
কিন্তু মৃত্যু হতে পারে অন্তরঙ্গমার ।

স্বদেশকে শেষবার সেই যে দেখেছি
কবরে গিয়েছে পরে কত প্রিয়জন,
যখনই তাদের কথা করেছি স্মরণ
বিষাদ বিমৌন চিত্তে রক্ত ঝরে পড়ে ।

স্মরণীয় তারা সব, স্মরণে তাদের
আমার বিষাদ ক্রমে ব্যাপ্ত ঘনীভূত ;
যেন শুয়ে আছে বুকে যারা বায়ুভূত—
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! তারা সরে যায়
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! বাতায়নপথে
এল স্বচ্ছ প্রভাতের ফ্রান্সের আলোক ;
আমারই সুন্দরী ভার্যা স্মিতহাস্যে ঢোকে,
স্বদেশ-চিন্তার ব্যথা কোথায় মিলাল ।

গ্রন্থ-পরিচয়

দূরের আকাশ

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৫৯। মিত্রালয়। জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ১২ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদশিল্পীর নামের উল্লেখ নেই। উৎসর্গ : 'গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় বন্ধু-বান্ধবেষু'। দাম দু টাকা।
অরুণকুমার সরকারের প্রথম কবিতাগ্রন্থ এই 'দূরের আকাশ'। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল বলে আমরা জানি না। প্রথম সংস্করণের কপিও দুষ্প্রাপ্য। কবিপত্নী শ্রীমতী প্রতিমা সরকারের কাছ থেকে যে কপিটি আমরা পেয়েছি, তা থেকেই 'দূরের আকাশ'-এর কবিতাগুলি এই 'কবিতাসমগ্র'-এ গৃহীত ও মুদ্রিত হল।

যাও, উত্তরের হাওয়া

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কানাইলাল সরকাব কর্তৃক ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ১২ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত। উৎসর্গ : 'প্রতিমা-কে'। দাম তিন টাকা।
অরুণকুমার সরকারের এই দ্বিতীয় (এবং শেষ) কবিতাগ্রন্থেরও দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। প্রথম সংস্করণের কপিও দুষ্প্রাপ্য। কবিপুত্র অভিরূপ সরকার যে কপিটি সংগ্রহ করে দেন, তা থেকেই 'কবিতাসমগ্র'-এ গৃহীত ও মুদ্রিত হল 'যাও, উত্তরের হাওয়া'র কবিতাগুলি।

সংযোজনা-১

'দূরের আকাশ'-এ কবিতার সংখ্যা মোট ছত্রিশ, 'যাও উত্তরের হাওয়া'য় পঞ্চান্ন। এ দুটি বইয়ের প্রথমটির ছাব্বিশটি ও দ্বিতীয়টির বাহান্নটি কবিতা 'অরুণকুমার সরকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সংকলন-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৩৮০, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। ভারবি। গোপীমোহন সিংহরায় কর্তৃক ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ১২ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। উৎসর্গ : 'শ্রীমান অভিরূপ সরকার কল্যাণীয়েষু'। দাম সাত টাকা।
অরুণকুমার সরকারের দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রায় চোদ্দ আনা-ই তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় স্থান পায়। উপরন্তু স্থান পায় তাঁর এমন আরও বাহান্নটি মৌলিক কবিতা ও তিনজন বিদেশি কবির (যোহান ওলফগাং ফন গ্যেটে, ওয়াল্টর স্যাভেজ ল্যানডর ও হেইনরিখ হাইনে) পাঁচটি কবিতার বঙ্গানুবাদ, যা কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি। বাহান্নটি কবিতার মধ্যে একটি ('বাবুন-রিমা-শম্পা-বুকুন-কে') মূলত ছোটদের জন্য লেখা। সেটিকে, মূলত-শিশুপাঠ্য আরও কিছু কবিতার সঙ্গে, এই গ্রন্থের 'সংযোজনা-৩' অংশে রাখা হল। তর্জমা পাঁচটিকে রাখা হয়েছে 'সংযোজনা-৪' অংশে।

সংযোজনা-২

গ্রন্থাকারে-অপ্রকাশিত যে প্রায় ষাটটি কবিতা তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনে সংযোজিত হয়, তার বাইরেও ছিল অরুণকুমারের এমন অনেক কবিতা, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু কখনওই তাঁর কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত

হয়নি। কবিপুত্র অভিরূপ সরকার ছোটবড় নানা পত্রিকার দফতর ও নানা গ্রন্থাগারে গিয়ে, পুরনো পত্রপত্রিকার ফাইল ঘেঁটে, এমন বহু কবিতা উদ্ধার করে এনেছেন। 'কবিতাসমগ্র'র এই অংশে সেগুলি সংযোজিত হল।

সংযোজনা-৩

এই অংশের অন্তর্ভূত হল শুধুই সেই কবিতাগুচ্ছ, যা মূলত ছোটদের জন্য লেখা। এর মধ্যে 'বাবুন-রিমা-শম্পা-বুকুন-কে' অরুণকুমারের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় স্থান পেয়েছে। অন্যান্য কবিতা ইতিপূর্বে কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি। প্রসঙ্গত একটি পরিচয়-সূত্র ধরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। 'বাবুন' অরুণকুমারের পুত্রের ডাকনাম। 'বুকুন' ডাকনাম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের। 'রিমা' ও 'শম্পা' তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্রী।

সংযোজনা-৪

এই অংশে সংযোজিত তর্জমা পাঁচটি অরুণকুমারের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সংকলিত হয়েছে। কবির রচনাবলিতে তাঁর মৌলিক কবিতা-ই শুধু থাকবে, এটাই প্রচলিত রীতি। এখানে এই কারণে রীতিভঙ্গ করা হল যে, যেহেতু তাঁর পৃথক কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত নয়, তাই 'কবিতাসমগ্র'তে সংযোজিত না-হলে তর্জমার ক্ষেত্রে অরুণকুমারের নৈপুণ্যের এই নিদর্শনগুলি হয়তো একেবারেই হারিয়ে যেত।

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

(প্রথম পঙ্‌ক্তি, কবিতার নাম, পৃষ্ঠা)

বর্ণানুক্রমিক এই সূচি প্রস্তুত করে দিয়েছেন সুনীল দাস